কবি

লিটিল কবিতাপত্র

বিজয় সংখ্যা'২০২১

সম্পাদক
র. আমিন

প্রচ্ছদ
সংগৃহীত

প্রকাশক
Amazon.com Inc., USA

সম্পাদকীয়

১৬ ডিসেম্বর আমাদের গর্বিত মহান বিজয় দিবস৷ এ দিনে বিশ্ব মানচিত্রে 'বাংলাদেশ' নামক এক রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল, বিজয়ের লাল সূর্য উদিত হয়েছিল। অনেক অশ্রুর বিনিময়ে অর্জিত আমাদের এ বিজয়, অনেক রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের এ বিজয়, অনেক আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের এ বিজয়। আমরা তোমাদের ভুলবো না- আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা আর বীরঙ্গনাদের। তাদের আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি, চেতনায় ধারণ করি তাদের মহান আত্মত্যাগ। বিজয়ের মাঝেও আরো বিজয়-আজ আমরা পা রেখেছি 'স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী'তে। সেই বিজয়ের সিঁড়ি বেয়ে প্রকাশিত হলো- আমাদের এবারের **বিজয় সংখ্যা**।

কবিতা

জহুরুল আলম - ৪
বিজয়-বন্দনা

শঙ্কর তালুকদার - ৫
মুক্তিযুদ্ধে মানবতা

বর্ণ - ৬
বিজয়

আহমেদ মাসুদ ইকবাল - ৭
তুমি এলে একাত্তরে

মাহাবুব চঞ্চল - ৮
যে ছবি লাল সালামে

শাহরিনা চৌধুরী - ৮
সোনার বাংলাদেশ

কাজী মিরা - ৯
বিজয় এসেছে

লুৎফর রহমান শান্ত - ৯
আমার দেশ আমার প্রেম

সুনির্মল বসু - ১০
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

চমন স্যাব্রিনা - ১১
যেখানে মুগ্ধতা সীমাহীন

গল্প

পারভীন - ১২
একজন মুক্তিযোদ্ধা সোলাইমান

র. আমিন - ১৪
প্রতিবিম্ব

প্রবন্ধ

জহুরুল আলম - ২০
বাঙালির সংগ্রাম ও বিজয়

শঙ্কর তালুকদার - ২৬
সুবর্ণ জয়ন্তীর শ্রদ্ধায় বিজয় দিবসের শপথ

একাত্তরের ঘাতক ও দালাল - ২৯

ফটোগ্রাফি

শাহরিনা চৌধুরী - ৩২
ছাতা'য় বিজয়ের লাল সবুজ

কাজী মিরা - ৩৩
বাগানে বিজয়ের লাল সবুজ

ফটো গ্যালারী - ৩৪

কবিতা

জহুরুল আলম
বিজয়-বন্দনা

কত লাবণ্যে সৃজিতা মাতা!
হে মোর জন্মভূমি,
শস্য-শ্যামলা, সুজলা-সুফলা
আমার বঙ্গভূমি।
মহাবিশ্বের যত লালিমা,
মহাকালের যত আছে মাধুরিমা,
সকলি সাজিয়ে তিলে তিলে গড়া
জননী তিলোত্তমা ;
তোমার পদে অর্ঘ্য সদা
হে মাতা-প্রিয়তমা।
অগনন জনপদে-নদনদে
শত নির্ঝরে বাহিতা,
লক্ষ কাননে, ফুল, পাখি, বনে
তুমি মাতা শোভিতা।
হিমালয় হতে নেমে আসা জল
তব অঙ্গে বহে ছলছল,
শত স্রোতধারা তোমাতে হারা,
হে মাতা জন্মভূমি,
আঁচলে তব মহাজলধি
সদা পদ যায় চুমি।
বন-পাহাড় আর ঋতু সমাহারে
শ্রেষ্ঠা ধরণী মাঝে,
শরৎ-হেমন্ত-শীত-বসন্তে
কতনা মধুর সাজে !
শত সহস্র বর্গী এলো,
ভিনদেশী অনাচারী,
সর্বসহা দূ:খিনী মাতা,
তবু সদা মনোহারী।
কত সুধামাখা তব যত কথা,
বর্ণমালা, ভাষা,
কত মধুর গান, ছন্দ ও সুর
প্রাণে প্রাণে প্রভাসা।
হানাদার এলো, যবে বলে গেল:
"আন ভাষায় কথা বল",
বাংলার শত দামাল ছেলে
বর্গীরে বিতাড়িলো।

তোমার শ্বাশত ভাষারে তারা
সুউচ্চে স্থাপিলো,
শত সন্তান তোর কোলে মা'গো
জীবন বিলিয়ে দিলো।
রক্ষিতে তব সম্ভ্রম-মান
রোষে-রণে-বাহুতোড়ে,
এই বাঙ্গালী অস্ত্র হাতে
বিতাড়ে লক্ষ দানোরে।
অকুতোভয় বাংলার ছেলে,
তোমার মেয়ে যত,
আঘাতে আঘাতে চূর্ণ করিলো
দানোদেরে অবিরত।
লক্ষ দানব পদতলে তব
হলো আভূমি নত,
মা'গো তোমারে মুক্ত করিয়া
কোটি সন্তান গর্বিত।
বিজয় এলো রক্তস্নাত
অগনন বলিদান,
শিকলমুক্ত করিতে তোমায়
নির্ভয়ে দেয়া প্রাণ।
আজি মুক্তিতে দিগ-দিগন্তে
বাংলার জয়গান,
জয়বাংলা ! বাংলার জয়
হোক চির অম্লান!

শঙ্কর তালুকদার

মুক্তিযুদ্ধে মানবতা

দুঃসংস্কার ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধের সে জয় -
যুদ্ধ নামের অভিশাপেই শাপমুক্তির অভয় !
কথা অনেক, ইতিহাসের আসলটা জানা নয় -
"দাবায়ে রাখতে পারবা না" সে প্রেরণা আজও কয় !
বছর গেছে অনেকগুলি অর্ধশত হতে যায় –
রক্ত চোখের ঝলসানো সে আগুন নেভে কোথায় ?
মাটির সাথে, ভাষার সাথে, দেশের পরিচয় –
একটিই সে জাতীর প্রয়াস, সাড়া বিশ্ব দেখে তায় !
তবুও সেই কণ্ঠনালীর খুনের পিপাসা ভরায় –
মানুষ হতে মুক্তিযুদ্ধ কেন ফেরায় মৎস ন্যায় ?
দাবায়ে রাখা যায়নি কিছুই, সময় সাক্ষী রয় -
বুকের কাছে জাতির নামে মানবতারই জয় !
আকাশ যেন তুলনা রয়, সংস্কার বরাভয় –
মুক্তিযুদ্ধ বাংলা মায়ের, যেন বিশ্বজনের হয় !
সেদিন সবাই নূতন ক'রে, হবে অবাক বিশ্ময় -
'জয়বাংলা' ধ্বনি যে সেদিন জাগবে বিশ্বময় !

বর্ণ
বিজয়

বিজয়,সে বড় অতুল খাজানা,
যে বা বোঝে তার কদরটি ভাই,
তার কাছে এই দুনিয়ার বুকে,
বিজয়ের চেয়ে বড় কিছু নাই।
তোমরা,যে যারা আজ বাংলায়,
ফেলে নিঃশ্বাস,ফের ভরো বুক,
তাদেরই সমীপে কথাটি আমার,
মাফ চাইবো না হলে ভুল চুক্।
বাংলার ছেলে বাংলা বোঝে না,
তারে তা বোঝাতে কিসের ভুল !
যারা মরে আজ বিদেশের লাগি,
ভাসায়ে স্বদেশ ও স্বজাতি-কুল।
তুমি যদি ভাবো মুক্তির রূপে-
মুক্তি আসলে ছেলেখেলা শুধু,
তবে আমি কবো তোমার মনে -
চারিপাশ জুড়ে মরুভূমি ধু-ধু।
লাখো শহীদের রক্তেরই কালি-
কলম সেজেছে পতাকার বাঁশ,
লেখা হলো যেই ঠিকানা তবে,
তারে ভেবে করো এর হা-হুতাশ।
বাংলার বুকে আসেনি বিজয়,
লটারির কোনো জয়ের মতো,
বুকভরা তাজা রক্ত নিয়েছে,
করে গেছে কতো গভীর ক্ষত।
এতটুকু শুনে তোমাদের যদি,
লোমকূপ গুলো দগ্ধ না হয়,
বাংলার তরে বুকটি না কাঁপে,
অবহেলা পায় মুক্তি-বিজয়।
না করে যদি হে চোখ ছলছল,
শক্ত না হয় ও হাতেরই মুঠি,
না ফোটে স্লোগান,জয় বাংলার,
ওষ্ঠ না কাঁপে গলা বেয়ে উঠি।
তবে বলি শোনো কয়টি কথা,
তোমার শরীরে যেই লহু বয়,
হতে পারো তুমি বিরাট মানুষ,
কিন্তু সে লহু মানুষেরই নয়।
মুক্তি কথাটি তোমার তো নয় -
পরজীবি তুমি পরাধীন বেশে,
বরণ করেছো চাবুকের ঘাত -
আপনি বন্দী আপনার দেশে।

আহমেদ মাসুদ ইকবাল
তুমি এলে একাত্তরে

তুমি আসবে বলেই, ছয় দফা আন্দোলন -
প্রতিবাদী জনতার মিটিং মিছিল,
আর শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত রাজপথ ।

তুমি আসবে বলেই, গণ-অভ্যুত্থান ঊনসত্তরে -
গর্জে উঠেছিল বীর বাঙালী একই সুরে,
আইয়ুব শাহীর কালো হাত –
ভেঙ্গে দাও, গুড়িয়ে দাও !
জনতার সংগ্রাম চলছে-চলবে।

তুমি আসবে বলেই, জেল জুলুম নির্যাতনের -
হুলিয়া মাথায় নিয়ে, সাত কোটি মজলুম জনতা,
স্টেনগান কাঁধে নিয়ে গেয়েছে মুক্তির গান ।

তুমি আসবে বলেই, ডাক এসেছে স্বাধীনতার -
শেখ মুজিবুরের বজ্রকন্ঠের অবিনাশী ভাষণ,
কাঁপিয়ে দিয়েছে বাংলার মাঠ ঘাট প্রান্তর ।

তুমি আসবে বলেই, মার্চের ভয়াল কালোরাতে -
শেখ মুজিবুরের আকাশ ফোঁড়া তর্জনীতে,
উড্ডীন বিজয়ের পতাকা উদয়ের পথে ।

তুমি আসবে বলেই, বাংলার যত দামাল ছেলে -
বুক ঝাঁঝরা করে রক্ত ঢেলে দেয় অহংকারে,
স্বাধীনতা তোমাকে বুকে জাপটে ধরে।

তুমি আসবে বলেই, কনকনে শীতের রাতে -
আমার মায়ের অধীর অপেক্ষা দুয়ার খুলে,
স্বাধীনতা তোমাকে দু'চোখ ভরে দেখবে বলে ।

তুমি আসবে বলেই, বোনের যে সময় কাটে না -
স্বাধীনতা এনে দেবে বলে সেই যে গেল ভাই,
ভাইটি যে তার আজও তো ফিরে এলো না ।

তুমি আসবে বলেই, মায়ের নিষ্ফল হাহাকার -
আর বোনের ললাটে কলঙ্ক তিলক,
স্বাধীনতা পরবাসে তুমি নির্বাক ছিলে বলে।

তুমি আসবে বলেই, যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপে -
তোমার দামাল ছেলেরা বুকের তাজা রক্তে,
লিখেছে স্বাধীনতার নাম, সোনার বাংলাদেশ ।

অগোণন প্রাণের বিনিময়ে তোমার জন্য –
মা'গো স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য,
পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করে, বিজয়ের একাত্তরে।

মাহাবুব চঞ্চল
যে ছবি লাল সালামে

যে ছবি আদর্শ চেতনার বীজ বোনে
যে ছবি কথা বলে প্রতিবাদ-প্রতিরোধে
যে ছবি তেজদীপ্ততা ছড়ায় মিছিল-সংগ্রামে
যে ছবি বারুদ জ্বালে বিপ্লবে, রক্তে
যে ছবি মুখরিত জয় বাংলা শ্লোগানে
যে ছবি শ্রদ্ধানত স্বাধীনতা-মুক্তিযুদ্ধে
যে ছবি যুদ্ধাহত নয় নম্বর সেক্টরে
যে ছবি স্বপ্ন আঁকে বাংলাদেশের চোখে
সে ছবি নিঃশঙ্ক চিত্তে এক পায়ে দাঁড়িয়ে
সে ছবি দ্বিধাহীন কন্ঠে ফাঁসির মঞ্চে
সে ছবি শোকে স্তব্দ হৃদয়ের বেদীদ্বার থেকে
মুষ্টিবদ্ধ প্রতিজ্ঞায় শক্তিবদ্ধ ঝড় তোলে
দুই পাথরের নীচে শোষক শাষকের কবর দে
সে ছবি কর্নেল আবু তাহের বিপ্লবী লাল সালামে

শাহরিনা চৌধুরী
সোনার বাংলাদেশ

হেমন্তের সকালে দেখি
শিশির ভেজা ঘাস !
অন্তরে ধারণ করি,
ডিসেম্বর বাঙালির বিজয়ের মাস !
এযে লক্ষ শহীদের রক্তঝরা দান ;
লক্ষ বাঙালির মুক্তিকামী প্রাণ।
বিরঙ্গনার এলোমেলো কেশ !
সব মিলে সৃষ্টি হলো
বিশ্বমানচিত্রে নতুন এক দেশ !
বিজয় ছিনিয়ে যার নাম হয়েছে
সোনার বাংলাদেশ !

কাজী মিরা
বিজয় এসেছে

বিজয় এসেছে, এসেছে বিজয়
হৃদয়ে আমার বিজয় এসেছে ;
বিজয় এসেছে-
বাংলার আকাশে বাতাসে ;
কৃষাণের লাঙ্গলে-বাউলের সুরে।
বিজয়ের বেশে
এলেন মহাবীর 'শেখ মুজিব' ;
সেদিন বজ্রধ্বনির আহ্বানে -
বাংলা মায়ের দামাল ছেলেরা,
লড়াকু সৈনিকেরা ঝাপিয়ে পড়েছিল
পাক হানাদার হায়েনা-শকুনের বিরুদ্ধে।
এ বিজয় মুক্তিযোদ্ধার-বিরঙ্গনার,
এ বিজয় আমার-তোমার-সবার ;
বিজয় এসেছে, এসেছে বিজয়
হৃদয়ে আমার বিজয় এসেছে।

লুৎফর রহমান শান্ত
আমার দেশ আমার প্রেম

দামাল বাঙালির সাহস ও শক্তির তর্জন-গর্জন,
দিয়ে রক্তের বিনিময়ে লাল সবুজের বাংলাদেশ অর্জন,
আমাদের মা ও মাতৃভূমি
তুমি সারা বিশ্বের অন্যতম সৌন্দর্য শোভন,
জন জাগরণে পাশবিক-অমানবিক-হিংস্রতা
পশুর তুল্য পাক শত্রু নিধনে,
এ দেশের সাহসী বীরের বীরত্বের তেজের দীপ্ত কিরণে,
ঝলমলিয়ে এলো আমার প্রিয়ভূমির স্বাধীনতার মাহেন্দ্রক্ষণ ।
যে জাতি দেশ ও মানুষের মুক্তির জন্য
নিজের জীবন বিপন্ন করে বুলেট-বোমার ভয় কে
জয় করে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে
হায়েনার হিংস্রতা নির্মূলে হাসিমুখে,
আমরা সেই বীর বাঙালির ঘরে জন্ম নেওয়া
তাদের উত্তরাধিকার বলে স্বাধীন দেশে
স্বাধীন ভাবে বেঁচে আছি পরম সুখে ।
আমার দেশ, আমার প্রেম, আমার অহংকার
এ দেশকে ছিনিয়ে নেবার সাধ্য নেই কারো আর,
প্রিয়ভূমি বাংলাদেশ তুমি রূপেও তুলনাহীন
তোমার কোলে ঠাই হয়েছে থাকিতে চাই চিরদিন।

সুনির্মল বসু

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

আদিগন্ত ব্যাপ্ত সবুজ জমি দেখেছে,
পদ্মার উতরোল ঢেউ জেনে গিয়েছিল,
লক্ষ তারার মিছিল-ঢাকার রাজপথ-রমনা রেসকোর্স,
গোপালগঞ্জ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম,
আকাশের শান্ত চাঁদ-তরুণ রৌদ্র ও উদাস দুপুর সাক্ষী,
অমর শহীদদের স্মৃতি সাক্ষী,
এ আকাশ জানে, এ সবুজ জানে, শহীদ বেদী জানে,
একজন মানুষ কী করে লক্ষ কোটি মানুষের স্বপ্ন ধরে রাখেন,
সবুজ দেশের মানচিত্রের উপর
একজন স্বপ্নময় স্বাধীনতার যাদুকর হেঁটে যান,
উত্তাল নদীতে সাম্পান ভাসে,
সবুজ জমিতে চাষীর স্বপ্নধরা থাকে,
আল পথে যেতে যেতে
পদ্ম শালুকের বন পেরিয়ে,
ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে মানুষ,
যারা মানুষের স্বপ্ন ভেঙে দেন,
তিনি দেয়ালে পিঠ রেখে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন,
এদেশের মাটি তাঁর কাছে প্রাণের চেয়েও খাঁটি,
কয়েদখানা-ফাঁসির দড়ি তাঁকে ভয় দেখাতে পারে না,
তিনি শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙালী,
আমি ভারতীয়, অথচ, আমারও নেতা তিনি,
তাঁর চোখ দিয়েই আমি বাংলাদেশকে চিনি,
আমার যৌবন কাল তাঁর বজ্রকন্ঠ ভাষণে
কেঁপে উঠেছিল একদিন,
সে বড় স্বপ্নের দিন,
আমারও শিকড় বাকড় রেখে এসেছি ওদেশে,
বাংলাদেশ আমার পিতৃভূমি,
আমার মাও বেড়ে উঠেছেন এই দেশে,
তিনি মানুষকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন,
স্বপ্নদ্রষ্টা মানুষ ছাড়া
কে আর এমন স্বপ্নের নকশীকাঁথা বুনতে পারেন,
তাঁকে যারা রক্তাক্ত করেছেন,
তারা আজ ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে,
মানুষ থাকে না, আদর্শ থেকে যায়,
অনির্বাণ প্রদীপ শিখার মত আদর্শ জেগে থাকে,
বাংলাদেশের জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে, সুদূর আকাশে
ধ্রুবতারা হয়ে তিনি চেয়ে আছেন
প্রিয় জন্মভূমির দিকে,
আকাশে বাতাসে মুজিবের কণ্ঠস্বর বাজে,
এই পূণ্যভূমিতে তাঁর জন্ম,
এই মাটিতেই তাঁর শয্যা,
এদেশের কিশোর তরুণদের মধ্যে
তিনি লক্ষ-কোটি মুজিবুর হয়ে বেঁচে রয়েছেন।

ধানক্ষেতে, পদ্মার ঢেউয়ে,
আলপথে, জলপথে সর্বত্র ধ্বনিত হচ্ছে তাঁর বজ্রকন্ঠ,
দাবায়ে রাখতে পারবা না,
এদেশকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ,
তিনি সেই বাঙালী, শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙালী,
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

চমন স্যাব্রিনা

যেখানে মুগ্ধতা সীমাহীন
বেঁচে থাকার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা
মা'য়ের জমানো পুঁনজি পুঁনজি ভালোবাসা
আর সন্তান হাসতে হাসতে
বুক পেতে দেয় শত্রুর বুলেটে. ..
যেখানে কালবৈশাখী হার মানে
ভয়াল কালো ২৫শে মার্চের রাত্রির কাছে
আর দামাল ছেলেরা হাসিমুখে
ঝাঁপিয়ে পড়ে বিনা অস্ত্রে ...
যেখানে মোরগের ডাকে ভোর হয়
আর বর্ষনে নিস্তব্ধ পল্লী
শত শত ফুলের মাঝে
কদম ফুলের মিষ্টি হাসি.....
যেখানে শীতের ঘন কুয়াশায়
নানীর হাতের পিঠা-পায়েস
কোকিলের কুহু-কাকলি
আর লেপের নীচে লাগামহীন আয়েশ..
এ যে আমার দেশ..
আমরা শতবার বেঁচে
শতবার মরি
আমরা স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনি
অখণ্ড আমাদের এই মাতৃভূমি....
এ আমাদের বাংলাদেশ
আমরা তোমায় ভালোবাসি !

গল্প

পারভীন

একজন মুক্তিযোদ্ধা সোলাইমান

গ্রামের নাম বিতারা।

মেঘনার তীর ঘেসে অবস্থিত শ্যামল সবুজ গাঁয়ের এক ছেলে সোলাইমান। বয়স ১২ কি ১৩, বুকে সাহস, মনে প্রবল তেজ ছিল তার। সে ছিল প্রতিবন্ধী, তার একটি পা ছিল অচল। কিন্তু মনে ছিল মুক্তির স্বপ্ন-সোলাইমান মায়ের সম্মান বাঁচাতে, বোনের হাঁসি ফোটাতে, গ্রামের দামাল ছেলের ছুটাছুটির রূপরেখা সতেজ রাখতে লড়াইয়ের পথ বেছে নেয়। চারদিকে বিকট শব্দ, গ্রামের কাছা-কাছি হানাদার বাহিনীর পদাচারনা। কেউ এস বলে, পালা। কেউ বলে, মা-বোন শিশুদের লুকাও। কিন্তু সোলাইমানকে কে বাঁচাবে ? সেতো দৌড়াতে পারেনা। তাকে নিয়ে বাব-মায়ের শুধু ভয়। মনের মধ্যে সব সময় আতঙ্ক কাজ করে। এই বুঝি শত্রুসেনারা এলো, এই বুঝি গুলি করে সব লন্ড-ভন্ড করে দিয়ে গ্রামটিকে শ্মশান বানিয়ে দিল। হঠাৎ আক্রমন। বাড়ির চারদিকে হানাদার বাহিনী ঘিরে ফেলেছে। সবাই পালাচ্ছে, কিন্তু সোলাইমান রয়ে গেল পুরো বাড়িতে একা। সে কি করবে ? সে লুকালো মেঝের নিচে। সেখানে নিরাপদ মনে করল না। বাড়ির পিছন দিকে ছিল একটি পরিত্যক্ত ডোবা। সে ভাবলো, ‘‘আমাকে বাঁচতে হবে"। তাই সে লুকিয়ে ধীরে ধীরে ডোবার মধ্যে নেমে গেল। কচুঁরিপানার নীচে চুপটি করে ডুব দিয়ে শুধু নাকটি জাগিয়ে রইল। দানবরা ফিরে গেলো। এক রাত ডোবায় থেকে সোলাইমান বাড়ি এস দেখে বাড়িটি জনমানব শূন্য এক বিরান বাড়ি।

দিনটি ছিল ৩০ শে মার্চ।

সোলাইমান তার হাতের লাঠিটির মাথায় লোহার পেরেক মেরে অস্ত্র বানালো। বাবা ফিরে আসল তার লাশ দেখতে। কিন্তু বাবা অবাক !

- একি বাবা, তুই বেঁচে আছিস! কি ভাবে, কি করে বেঁচে আছিস?

সোলাইমান বলল,

- বাবা আমি বুঝে গেছি, বাঁচতে হলে লড়াই করতে হবে। আমি যোদ্ধা হব, মুক্তির জন্য লড়াই করব। আমি মুক্তিযোদ্ধা হব।

বাবা বললেন,

- সোলাইমান, বাবা তুই স্বাভাবিক না- তুই পারবি না।

সোলাইমান ভাবলো, আমাকে পারতেই হবে। আমি দেখেছি কিভাবে দানবেরা দাঁত বের করে হেঁসেছে। কিভাবে অবলা পশু হত্যা করেছে। দেখিছি গ্রামের মানুষ কিভাবে ভয় পেয়ে ছোটা-ছুটি করেছে। সোলাইমানের মনে হিংস্রতা দমনের প্রলয় উঠেছে। পশুদের আক্রমন থেকে দেশমাতাকে রক্ষা করার আশা জেগেছে।

বাবা ভাবলেন- ছেলেকে বাঁচানোর একটা রাস্তা আছে। ছেলেকে আর ঠেকানো যাবে না। তাকে ব্যবসার কাছে লাগিয়ে দেব। বাবা সোলাইমানকে লবন ও কেরোসিন তেল বিক্রি করার কাছে লাগিয়ে দিলেন। সোলাইমান সাথে বুদ্ধি করে কিছু সিগারেট বিক্রি করার ব্যবসা শুরু করল।

সোলাইমান ভাবলো, এবার কিছু করতে পারব। পাক-হানাদার বাহিনী আমার দোকানে আসতো। তারা ভাবতো আমি অচল- দেশ ও জনপদের খবর আমার কাছে নেই। তাই দানবরা আমার পাশে বসে সিগারেট টানে আর আক্রমনের পরিকল্পনার কথা আলাপ করে। আমি সব ওয়াকিবহাল হই, সাথে সাথে মুক্তিসেনারদের কানে সবকথা পৌছে দেই।

- গনি ভাই, আগামী রবিবারে পালাখাল গ্রামটি আক্রমন করবে হানাদারা। আমি তোমাদের সাথে অপারেশনে যাব।

- না, সোলাইমান, তুই এখানেই থাকে। এখান থেকে সব বার্তা দিলেই হবে, দানবদের প্রতি লক্ষ্য রাখবি।

একজন উত্তর দেয় ।

- আমি প্রতিদিন যে কোন সময় একবার আসব।

ঠিক রাত আটটার দিকে।
সোলাইমান বাড়ি যাচ্ছে। সামনেই একদল হানাদার, সে ভয়ে পেয়ে যায় । কি করবে ? ভাবতেই একটা বুদ্ধি এলো তার মাথায়। দাদিমা বলতেন, জোঁনাকি পোকা দেখলে নাকি হিংস্র দানবেরা ভয় পায়। তাই সোলাইমান সব সময় একটা কৌটার ভেতর জোঁনাকি পোকা রাখত। আজ সূত্রটা কাজে লাগলো। সে কিছু পোকা ছেড়ে দিল, হানাদার বাহিনীরা আলো দেখে ফাঁকা স্থানে গুলি করতে লাগলো। এক পর্যায়ে ভয় পেয়ে অস্ত্র ফেলে পালালো। সোলাইমান খুশি, একদিকে অস্ত্র গুলো পাওয়া, অন্য দিকে নিজেকে বাঁচানো-দুটো বুদ্ধিমানের কাজ হলো। সকাল হতেই রহিম ভাই এসে হাজির।
- রহিম ভাই, আজ কাজ হয়েছে, সব ঘটনা খুলে বলি- অস্ত্র গুলো বনের ঝাঁউপাতার নীচে রেখে এসেছি।
- ঠিক আছে ছোট ভাই। শত্রুরা এ গ্রামে আর আসবে না। কাল রাতে যে ভয় দেখিয়েছ তুমি। তা একজন মুক্তিযোদ্ধার
কাজ করেছ তুমি।
- না, রহিম ভাই গ্রাম নয়, দেশ থেকে রাজাকারদের তাড়াতে হবে। পাক-বাহিনীদের ক্যাম্পটি ধ্বংস করতে হবে।
- ভাই আমি সঠিক সময় হানাদার বাহিনীর নীল নকশা তোমাদের দেব, ভয় নেই।

কয়েক দিন পর হানাদার বাহিনীর দলপতি সোলাইমানদের দোকানে এলো, তারা আলাপ করল আজ আক্রমনের শেষ দিন। গ্রামটি উড়িয়ে দেবে এবং এলাকার সব বুদ্ধিজীবিদের হত্যা করে চলে যাবে। সোলাইমান খবরটি মুক্তিযোদ্ধাদের জানালো। তারা পরিকল্পনা করে গ্রামের পথে বিরাট একটি গর্ত করে লতা-পাতা দিয়ে মুখটি ঢেকে রাখলো। সোলাইমান হানাদারদের ক্যাম্পের দিকে গেলো।
একজন রাজাকার দেখে বলল,
-কিরে ? কি চাস?
- হ্যা ভাই, কিছু না । শুনলাম, আপনারা নাকি কাল চলে যাবেন? আপনাদের জন্য আমার মায়া হয়। তাই শেষ দেখা করতে এলাম। শুনেছি আজ রাতে গ্রামের স্কুলে মুক্তিবাহিনীদের সভা আছে। খবরটি আপনাদের দিতে এলাম, যাবেন নাকি? খবর পেয়ে পাক হানাদার বাহিনীরা মুক্তিবাহিনীদের আক্রমন করবে বলে ছুটে চলল। ছুটে আসতেই একেক করে গর্তে পড়তে লাগল দানবরা, আর উঠতে পারল না। সোলাইমান গর্তের মধ্যে কোরোসিন ঢেলে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল। গ্রামের মুক্তিবাহিনীরা ক্যাম্পটি গুলি করে উড়িয়ে দিল, গ্রামের মানুষেরা বেঁচে গেল।

র. আমিন
প্রতিবিম্ব

রাত্রীর নিঝুমতা মনিরের অভিজাত বাসভবনের বারান্দায় ভরে গেছে। সমস্ত শহর নিঝুমতায় ঝিমিয়ে পড়েছে। দুই একটি বাসার আলো দেখা যাচ্ছে। মনির তার দোতলায় বারান্দায় দাড়িয়ে অদূরে নিস্তব্ধ সদর রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে নির্বিকারভাবে। হয়তবা অতীতের কোন বিয়োগান্ত ঘটনার স্মৃতিচারণ করেছে। অজান্তেই মনিরের চোখ ভিজে গেল। একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আপন মনে বলে উঠল,
-না-না, আমি বড় অবিচার করেছি।
আবার একাকী নিস্তেজ হয়ে গেল মনির। মনির-বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। শহরের এক প্রভাবশালী শিল্পপতি- মনির চৌধুরী। ভদ্রলোক অবিবাহিত, তাই তার এই প্রাচুর্য ভোগ করার কোন উত্তরাধিকারী নেই। এতে প্রাচুর্য থেকেও মনিরের জীবনে সুখ নেই। অতীতের অনেক স্মৃতি তাকে কষ্ট দেয়। ফলে তার কাছে সুখের সংজ্ঞা অন্যরকম। বাসভবনের সামনে পাতাবাহারের পাতাগুলো মৃদুমন্দ বাতাসে কেঁপে উঠল। মনির বারান্দায় পায়চারী শুরু করল। পূর্বের মত উচ্চারণ করল। ঠোটে সিগ্রেট জ্বলছে।
আপন মনে আবার বলল,
বাংলাদেশ আমায় তুমি ক্ষমা কর, আমি বড় অবিচার করেছি তোমার উপর।
-বশির, বশির।
মনির চিৎকার করে উঠলেন।
কোন সাড়া পাওয়া গেল না। কিছুক্ষণ পর বশির এসে দাড়াল পাশের কক্ষ হতে।
-এক গ্লাস পানি নিয়ে আয়। মনির আদেশ দিল।
বশির কক্ষ হতে বেরিয়ে গেল এবং কিছুক্ষণ পর পানি সহ গ্লাস নিয়ে এল। মনির বশিরের কাছ থেকে গ্লাসটা নিল। এ বাড়িতে মনির এবং কেয়ারটেকার বশিরই বাস করে। মনির গ্লাসে চুমুক দিতেই পাশের বস্তি থেকে এক মিষ্টি সুর ভেসে এল। মাঝে মাঝেই ঐ বস্তি থেকে সুর ভেসে আসে গভীর রাতে। কিন্তু আজকের সুর কেন যেন মনিরের হৃদয় আকর্ষণ করল। মনির উদাসীনভাবে শুনতে থাকলো সুরটি। পানি খাওয়া থেমে গেল।
-আচ্ছা বশির ঐ সুর কে বাজায় ?
মনির বশিরকে অস্থিরভাবে বলল।
- স্যার, বস্তির এক অন্ধ গায়ক।
- অন্ধ?
- জী স্যার, বড় দুঃখী ছেলেটা।
- কি নাম ?
- প্রতিভা চৌধুরী।
বশিরের কথাটাই মনির আনমনাভাবে উচ্চারন করল। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধে কেটে গেল। হঠাৎ আবার বলল,
-কি করে ?
-গান গেয়ে গেয়ে রোজগার করে স্যার, শহরের একজন বড় গায়ক।
-বাবা-মা কি করে ?
-বাবা-মা নেই।
-আহা ! আচ্ছা কি সুর বাজে বলতে পারিস ?
-কি জানি স্যার ?
-আচ্ছা তুই ঘুমিয়ে পড়, যা।
বশির চলে যায়। বশির চলে যাবার পর মনির আবার পায়চারী শুরু করে গ্লাস হাতে। আবার স্মৃতিচারনে ফিরে যায়। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে আপন মনে বলতে থাকল,
-না না এখন প্রাচুর্য তো আমি চাইনি।
আবার নিঃশব্দে পায়চারী করতে থাকে। হঠাৎ কি মনে করে, গ্লাসটি ছুড়ে মারে বাগানে।
চিৎকার করে ওঠল,
- না না এসব প্রাচুর্যতো চাইনি।

বিকেলের মিষ্টি রোদে মনিরের বাসভবন ঝলমল করছে। মনির জানালার পাশে দাড়িয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছে। বাসভবনের পাশেই বস্তি, এই বিকেলে আবার গান বেজে উঠেছে।

'আমরা প্রগতির পথযাত্রী............... /
আমরা কৃষক আমরা শ্রমিক.........
সাম্যবাদের বিপ্লবী সৈনিক..............'

মনির জানালা দিয়ে আনমনা হয়ে তা শুনছে। এমন সময় দরজায় কড়া নড়ার শব্দ শোনা গেল। কিছুক্ষণ পর দরজা খোলার শব্দও পাওয়া গেল। দ্রুতগতিতে বশির সহ এক অচেনা নারী মনিরের সামনে এসে দাড়াল। মনির নারীটিকে দেখে হঠাৎ চমকে উঠে সামলে নিল। নারীটির বয়স চল্লিশ, পরনে নোংড়া পোষাক, চুলগুলো এলোমেলো, চোখ গুলো রক্তাক্ত উম্মাদের মত মনিরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল। সে চাহনীতে যেন প্রতিশোধের নেশা। নারীটিকে পাগলী ছাড়া আর কিছু বলা যাবে না।
-ভাল আছেন মনির সাহেব ?
তিরস্কারের সুরে বলে উঠল পাগলী,
-কে তুমি ?
প্রশ্ন করল মনির।
-তোমাকে আমি চিনতে পারছি না।
পুনরায় মনির বলল ।
-হারামজাদা, ফিরিয়ে দে বাঙলার স্বাধীনতা।
গর্জে উঠল পাগলী যেন।
-ষ্টপ! ক্রেজি কোথাকার। নিয়ে যা বশির এই পাগলীকে।
চিৎকার করে উঠল মনির।
-হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ আমি পাগলী?
শেষ কথার প্রতিধ্বনি হতে লাগল। বশির মনিরের আদেশ পালন করল। জোর করে পাগলীকে নিয়ে গেল। মনির আবার মুখ ফিরলো রাস্তার দিকে, ঐ সুরে কর্ণপাত করল। অন্ধ গায়ক এখনো গেয়ে যাচ্ছে,
'হে সৈনিক ভুলে কি গেছ.............
কিউবার আগুনে ভীত মার্কিন সেনা............'
মনির আনমনা শুনে যাচ্ছে আবার গানটি। গানটি শেষ হবার সাথে সাথে মনির চিৎকার করে উঠল,
-বশির, বশির।
বশির এসে সামনে দাড়াল,
-জী ।
-পাগলী চলে গেছে ?
-জী স্যার ।
-তুই এক কাজ কর বস্তির ঐ অন্ধ গায়ককে নিয়ে আয়।
-ঐ অন্ধকে নিয়ে আসব স্যার?
অবাক হয়ে বশির উল্টো প্রশ্ন করলো।
-হ্যাঁ, ওকে নিয়ে আয়, ওর গান খুব ভাল লাগে।
কিছুক্ষণের ভেতর বশির অন্ধ গায়ককে নিয়ে এল।
-অন্ধ গায়ক ছালাম জানালো। মনির ছালামের জবাব দিয়ে বল্ল,
-বস। তোমার সাথে কথা আছে।
-কি বলবেন ?
- তোমার গান শুনব বাবা।
- বাবা ! ঐ নাম ধরে ডাকবেন না। ঐ শব্দটাকে আমি ঘৃণা করি ।
ক্ষোভের সাথে যেন বলে উঠল অন্ধ।
- ঘৃণা কর ? কেন ?
সে ইতিহাস জানতে চাইবেন না, আমাকে অনুগ্রহ পূর্বক অন্য নামে ডাকুন।

- অন্য নামে ? ঠিক আছে তোমার নাম সুরনায়ক দিলাম।
- এ বিশেষণটা বোধহয় আমার উপযুক্ত না, থাক না। এবারে বলুন কি প্রয়োজন আপনার ?
- তুমি আমাকে একটা গান শুনাবে ?
- এ মুহুর্তে গান ? কেউ অনুরোধ করলে, প্রত্যাখান করতে পারি না। ঠিক আছে গাইছি,

'ক্ষুধায় ক্ষুধার্ত আমি,
ক্রোধে ক্রোধান্বিত আমি,
রণক্ষেত্রে প্রতিবিপ্লবী রুখতে বিধ্বংসী আছি।'

- সুন্দর! তুমি তো খুব বিপ্লবী বাবা..................
- আবার ঐ নামে সম্বোধন ?
- দুঃখিত সুরনায়ক, আমি ক্ষমাপ্রার্থী। ঠিক আছে গেয়ে যাও।
- আশ্চর্য আজ আর গাইতে পারছিনা, আগামী আর একদিন শুনাবো।
- যাহোক এবারে বল, এর বিনিময়ে আমি কি সাহায্য করতে পারি ? কারন তোমার ঐ অমূল্য কথাগুলোর আমি কি দিয়ে মূল্যায়ন করি ?
- যদি কথাগুলো আপনার নিকট অমূল্যই হয়ে থাকে, তবে অমূল্য কথার অর্থ দিয়ে কোন মূল্যায়ন করা যায় না।
- সুরনায়ক আমাকে আর লজ্জা দিয়ো না।
- আপনি অনুমতি দিলে আমি চলে যেতে চাই।

চলে যাবার জন্য পা বাড়ায় অন্ধ গায়ক।
- চলে যাবে ? আর একটু বস না।

অনুরোধ জানায় মনির।
- না থাক, আজ আর নয়, আর একদিন আসব।
- ঠিক আছে, সুরনায়ক কথা দাও আবার আসবে।
- কথা দিলাম।

অন্ধ ধীর পদক্ষেপে কক্ষ ত্যাগ করল।
মনির পথের পানে চেয়ে থাকল।

মনির সেদিন কর্মস্থল থেকে এই মাত্র ফিরেছে। বাসায় ফিরে দেখল, অন্ধ গায়কটি অপেক্ষা করছে,

- আরে সুরনায়ক যে, কখন এলেন ? বসুন, বসুন আমি আসছি।
মনির পাশের কক্ষে চলে গেল। পোষাকটা বদল করে কিছুক্ষণ পর আবার এসে দাড়াল অন্ধ গায়কের সামনে। একটি আসনে বসতে বসতে মৃদুস্বরে বলল,
- সুরনায়ক বলুন কি সমস্যা ?
- কোন সমস্যা নেইতো।
- তবে?
- আপনার কাছে আসব বলে কথা দিয়েছিলাম।
- ও দুঃখিত, দেখুন একদম ভুলে গেছি। যাক গে, এবারে বলুনতো আপনি থাকেন কোথায় ?
- আমি ? ঐ বস্তিতে।
হাত দিয়ে দেখাল অন্ধ গায়ক। কিছুক্ষন নিঃশব্দে কেটে গেল।
- ওখানে কে কে থাকে, আপনার ?
মনির আবার প্রশ্ন করল ।
- কেউ নেই ?
- কেন বাবা-মা ?
- আবার ঐ প্রসঙ্গ বাবা-মা ? ঠিক আছে, প্রসঙ্গতই বলছি বাবা- তাকে খুঁজি জন্মের পর থেকে, কিন্তু আজ পর্যন্ত পেলাম না, এক কাপুরুষ, দায়িত্বহীন বাবা, পুত্রের দায়িত্ব থেকে মুক্ত।
চোখে জল এসে যায় অন্ধ গায়কের।
- সুরনায়ক, বুঝি না তোমার কথা। ঠিক আছে আর জানতে চাইবো না। যাকগে, সুরনায়ক এবারে একটি গান গেয়ে মন হালকা করুন।
- ঠিক ধরেছেন। হ্যা ঐ গানই আমাকে সবচেয়ে আনন্দ দেয়, গান কখনো বিশ্বাসঘাতক নয়। গানেই সব প্রাণ।
- সুরনায়ক, আপনি কোন ধরনের গান গান ?
- যদিও লালন-দ্বিজেন্দ্র আমাদের ঐতিহ্য এবং রবীন্দ্র-নজরুল আমাদের অহঙ্কার, তথাপি আমি গণমানুষের গান গাই।
- ঠিক আছে শুরু করুন।
- আজকে হালকা মেজাজের একটি গান পরিবেশন করবো -

***‘নাচছে নাচছে, জনতা নাচছে
গণতন্ত্রের পুতুল নাচে.................***

গেয়ে যায় অন্ধ গায়ক বাদ্যযন্ত্র ছাড়াই।

***‘খেলছে খেলছে, ইবলিশ খেলছে
হিরোইন আমদানী হচ্ছে ।***

- প্লীজ আর নয়, আমি আর শুনতে পারছিনা সুরনায়ক।
গানের মাঝে অস্থির ভাবে বলে ওঠল মনির। অন্ধ গায়ক উঠে দাড়ায়।
- ঠিক আছে আজ আর নয়, এবারে আসি, আবার আসব।
- ধন্যবাদ সুরনায়ক। আবার এসো কিন্তু।
অন্ধ গায়ক বিদায় নিয়ে চলে যায়।

মনির আজ গাড়ীতে করে বাড়ীতে ফিরছিল। বাড়ীর গেটের সামনে দেখল, সেই পাগলী দাড়িয়ে আছে। পাগলীটা গাড়ীর একদম সামনে এসে দাড়াল। মুনির দেখল, পাগলীটা এক্সিডেন্ট হয়ে যাবে। তাই অতি দ্রুত গাড়ীর ব্রেক কষল, ব্রেক কষে পাগলীর একদম সামনে এসে দাড়াল। পাগলী গাড়ীর জানালার ভেতরে হাত দিয়ে বলল,
- ফিরে দে বাংলার স্বাধীনতা।
পাগলীর উক্তি শুনে কিছুক্ষণ চিন্তা করে মুনির বিরক্তির সুরে বলে উঠল,
- মাফ কর বাবা।
- হ্যাঁ-হ্যাঁ- হ্যাঁ বাচার বুদ্ধি করছো।
খিল খিল করে বিশ্রিভাবে হেসে উঠল পাগলী।
- কি যন্ত্রনা, আবার সেই ক্রেজি, কি চাও ? এই দাও দশ টাকা।
বিরক্ত হয়ে দশ টাকার একটি নোট পাগলীর দিকে ধরল। পাগলী নোটটা নিয়ে ছুড়ে মারল মনিরের দিকে।
- দশ টাকা দিয়ে কিনতে চাও বাংলাদেশ ?
এমন অবস্থায় মনির চিৎকার করে উঠল,
- ননসেন্স !
রাগে কাঁপতে কাঁপতে মনির গাড়ীতে ষ্ট্যাট দিল। গাড়ী গিয়ে থামল গাড়ী বারান্দায়। মনির গাড়ী থেকে নেমে দোতলায় সিড়িতে ওঠার জন্য পা দিল। এমন সময় আবার ঐ পাগলী দৌড়ে এসে সামনে দাড়াল। পাগলীকে পুনরায় দেখে মনির চিৎকার করে উঠল,
- বশির, বশির বিদায় কর এই পাগলিকে, যতসব যন্ত্রনা-
- পারবে না মনির সাহেব, আমাকে বিদায় করতে পারবেনা, বাংলার স্বাধীনতা ফিরে না দেয়া পর্যন্ত আমি কখনো ফিরে যাবো না।
আবার হেসে উঠল পাগলী।
- এই পাগলী, কিসের বাংলাদেশ ? কে তুই, নাম কি তোর ?
গর্জে ওঠল মনির
- হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ।
কিছুক্ষণ অট্টহাসল পাগলী। হাসি থামিয়ে বলল,
- ৭১- এ আমার অনেক স্বপ্ন ছিল, যা তুমি শেষ করে দিয়েছো।
রাগে ফোস ফোস করতে করতে বেপরোয়া ভাবে পাগলী মনিরের কলার চেপে ধরল।
- এ কি ? ছিঃ ছিঃ বশির, বশির এদিকে আয়। ও অসহ্য ! পাগলীটাকে বিদায় কর তাড়াতাড়ি।
বশির দোতলা থেকে দৌড়ে নেমে এল। মনিরও সাথে সাথে পাগলীর কাছ থেকে সরে এল। বশির এমন অবস্থা দেখে পাগলীকে জোর করে বের করে দিল গেটের বাইরে। মনির দ্রুত হাফাতে হাফাতে উপরে উঠতে থাকল।
পরদিন বিকেলের দিকে মনির গাড়ী নিয়ে বের হলো। মন মেজাজ আজ ভালো নেই, কারণ গতকালের ঘটনা ওকে মর্মাহত করেছে। পূর্বের স্মৃতিতে সে ফিরে গেছে, গাড়ীতে উঠে আনমনা গাড়ী চালাচ্ছে।
গাড়ী ধীরে ধীরে এগুচ্ছিল। বাসা থেকে সে অনেকদূর চলে এসেছিল। হঠাৎ সামনেই রাস্তায় দেখল প্রচণ্ড ভীড়। কি যেন একটি দুর্ঘটনা ? প্রচন্ড ভীড়। মনির ব্রেক কষল ভীড়ের সামনে। গাড়ী থেকে নেমে ভীড় ঠেলে চলে গেল সামনে, গিয়ে যে দৃশ্য দেখল তাতে হতভম্ব হয়ে গেল। মনির দেখল, অন্ধ গায়ক রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে রাস্তায়।
জনতা কিংকর্তব্যবিমুঢ়ের মত দাড়িয়ে আহা-উহু করছে। দ্রুতগতিতে মনির অন্ধ গায়কের পাশে গিয়ে দাড়াল, বাহু ধরে নাড়ী পরীক্ষা করে দেখল, নাড়ী সচল। অন্ধ গায়কের মাথা দিয়ে রক্ত ঝরছে। জনতার কাছে জানতে পরল, এক গাড়ীর ধাক্কায় ছিটকে পড়ছে অন্ধ গায়ক। মনির ওর দেহটাকে কোলে তুলে নিল গাড়ীতে। বাসায় নিয়ে এসে ডাক্তার দেখল, ডাক্তার উপযুক্ত ঔষধ দিয়ে চলে গেল। ডাক্তার চলে যাবার পর ধীরে ধীরে অন্ধ গায়কের জ্ঞান ফিরে এল। অন্ধ গায়ক ধীর ধীরে বলল,
- আমি কোথায় ? ও প্রচন্ড ব্যথা !
- সুরনায়ক তুমি আমার এখানে।
- ও মনির সাহেব আপনার কাছে ? কেন অযথা কষ্ট করছেন ?
- সুর নায়ক, তুমি মানুষের উপকার করাকে কষ্ট বলছ ?
- তবে কি বলব ? উপকার করলে কষ্ট পায় বলেইতো মানুষ মানুষকে ভাল বাসতে চায় না।
- তুমি শান্ত হও সুর নায়ক ।

সুর গায়ক আর কোন কথা বলল না, তন্দ্রায় হারিয়ে গেল। কিছুক্ষণ নিস্তব্দে কেটে গেল। মুনির চৌধুরী কক্ষের মধ্যে পায়চারী করতে লাগলেন। অন্ধ গায়ক বিছানায় শান্তভাবে ঘুমিয়ে পড়েছে, মাথায় ব্যান্ডেস। মনির অপলক নয়নে কিছুক্ষণ অন্ধ গায়কের দিকে তাকিয়ে থাকল, বুকের ভেতর কেমন যেন ব্যাথা অনুভব করল।
হঠাৎ পদশব্দে দরজায় দিকে তাকাতেই দেখল, সেই পাগলী এগিয়ে আসছে। ভুত দেখার মত চমকে উঠে, মনির পাগলীর সামনে এসে দাড়াল,

- আবার তুই এসেছিস ?
- হু-হু-হু।

খিল খিল করে হেসে উঠল পাগলী।

- তুই কি চাস দেব, তবু তুই এখন যা, অনুরোধ।

অনুরোধের সুরে বলল মুনির। পাগলী একবার অন্ধ গায়কের অসুস্থ শরীরের দিকে দৃষ্টিপাত করল আর পরক্ষনেই বলে উঠল,

- বাংলার স্বাধীনতা ফিরে দে, ৭১-এর সতীত্ব ফিরে দে।
- সেজন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। দেখ না ঐ ভুলের জন্য আমিও অনুতপ্ত। আজ আমি বাংলার মানুষের কাছে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারি না।
- তুমিও রক্ষা পাবে না মনির চৌধুরী, আজ শহরের একজন জনপ্রিয় মানুষ পুত্রের দাবী নিয়ে তোমার কাছে আসবে।
- বলিস কিরে ?

আশ্চর্যভাবে বলে উঠল মনির, কিছুক্ষণ নীরবতা।

- হ্যা, তোমার সেই সন্তান ঐ যে বিছানায়, শুয়ে আছে শহরের জনপ্রিয় গায়ক-প্রতিভা চৌধুরী।

কথাটি বলে পাগলী এগিয়ে গেল ঘুমন্ত অন্ধ গায়কের দিকে।

- কি বললে ? ঐ সুর নায়ক আমার সন্তান ? বাবা! বাবা! বাবা!

চিৎকার করে উঠল মনির। মনিরের চিৎকারে অন্ধ গায়কের ঘুম ভেঙ্গে গেল,

- আ! ও! বাবা! বাবা!................. না, বাবার কথা বলোনা। তুমি বলেছ বাবা এ কক্ষেই আছে, শহরের প্রভাবশালী শিল্পপতি মনির চৌধুরী। না, আমি আর এই নাম শুনতে চাই না। এ বাবা নরঘাতক পিশাচ! হাজার সেলিনার চিৎকারে কেঁপে ওঠাবে, বাংলার আকাশ-বাতাস আর তাকে অভিশাপ দেবে যুগে যুগে।
- বাংলা আজ তোর প্রতিশোধ নেবে, বাংলা আজ তোর প্রতিশোধ নেবে................

কথাটি বলে পাগলী পাশের চেয়ার তুলে মুনিরের মাথায় প্রচন্ড বেগে আঘাত করল। সাথে সাথে মনির জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে।

পরদিন প্রতিটি খবরের কাগজের শিরোনামে ছাপা হয়-
'শহরের জনপ্রিয় অন্ধ গায়ক প্রতিভা চৌধুরী মর্মান্তিক গাড়ী দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেছেন' ।

প্রবন্ধ

জহুরুল আলম
বাঙালির সংগ্রাম ও বিজয়

একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং জাতির সুদীর্ঘ সংগ্রামের একটি যুক্তিসঙ্গত পরিণতি। মুক্তির এবং স্বাধীনতার জন্য জাতির সংগ্রামে অন্তর্ভুক্ত ছিল ১৯৪৭ সাল বা তারও বহু আগে থেকেই বাঙালির ছোট-বড় অনেক আন্দোলন। এই আন্দোলনগুলোই একত্রিত হয়ে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে এক সময় বহুমাত্রিকতার আবহ থেকে একমাত্রিক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে তাই ১৯৭১ সালের নয় মাসের কাঠামোর ভেতরে আবদ্ধ করা যায় না। পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পরেই পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক পরিমন্ডলে ব্যাপকভাবে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটতে থাকে। পাকিস্তানী শাসকদের ক্ষমতার অপব্যবহার, গণতন্ত্রহীনতা, সুশাসনের অভাব ও সর্বোপরি পাকিস্তানের কাঠামোর ভেতরে পূর্ব বাংলার প্রতি ধারাবাহিক বিমাতাসুলভ আচরণ, যা মুসলিম লীগের এবং পাকিস্তানের নীতির মূল উপাদান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, তা এ দেশের মানুষের চেতনাকে তথাকথিত ‘মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধের’ মিথ থেকে বহু দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। পাকিস্তান আন্দোলনে এ দেশের আপামর জনতার অকুণ্ঠ সমর্থন ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের গঠনমূলক ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। কিন্তু পাকিস্তান গঠনের পর পরই এ দেশের ছাত্র, জনতা ও রাজনীতিবিদরা পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিমাতাসুলভ আচরণের ফলে ভালভাবেই হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হলেন যে তাদের এই সমর্থন ছিল একটি ঐতিহাসিক ভুল।

মূলত: পাকিস্তানের জন্মের মধ্যেই এই রাষ্ট্রের মৃত্যুর ফরমান ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বাণী লিখিত ছিল। ধর্মীয় ভ্রাতৃবোধের যে কল্পকাহিনী মুসলিম লীগ রচনা করেছিল, সে ভ্রাতৃত্ববোধ একটি জাতিরাষ্ট্র গঠনের জন্য যথেষ্ট ছিল না। যে কারণে যখনই রাজনৈতিক ক্ষমতার বিষয় এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের বিষয়গুলো নিষ্পত্তির বিষয় তুলে ধরা হয়েছে, তখনই পশ্চিম পাকিস্তানীরা বাঙালিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণেও এই কথাটি উচ্চারিত হয়েছে। মৌলিক স্বার্থের ব্যাপারে পাকিস্তানীরা এদেশের মানুষের সঙ্গে কোন প্রকার সমঝোতায় কখনোই আসেনি। তাই ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে বাঙালির যুক্তফ্রন্টের নিরঙ্কুশ বিজয়ের পরও বাংলার মানুষকে পাকিস্তানের শাসনক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। সেই একই ব্যাপার ঘটেছিল ১৯৭০ এর নির্বাচনের পরও। কিন্তু ততদিনে বাঙালির নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের উত্থান হয়েছে, যে উত্থানকে আগের মতো কিংবা তার চেয়েও আরও অনেকগুণ বেশি শক্তি প্রয়োগ করেও দমানো সম্ভব হয়নি। পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই ধারাবাহিকভাবে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে যে ধরনের জাতিগত বৈষম্যের চর্চা প্রতিষ্ঠানিকভাবে করা হতে থাকে তাতে করে ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিকভাবে সম্পূর্ণ আলাদা দুটি অংশের একসঙ্গে বসবাস করার কোন যুক্তি ছিল না। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পাকিস্তানী শাসকবর্গ পরিবর্তিত হলেও শাসনের কোন চরিত্রগত পরিবর্তন সাধিত হয়নি। কাজেই এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, পাকিস্তানের ধ্বংসের পিছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে একটি কৃত্রিম বন্ধনের মাধ্যমে এর অস্বাভাবিক অভ্যুদয়। পাকিস্তানের দুটি বৃহৎ অংশের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিলই অধিক ছিল।

অপরদিকে বাংলায় অতি প্রচীন কাল থেকেই অনেক শক্তিশালী জাতিগত উপাদান সৃষ্টি হয়েছিল যা পাকিস্তান সৃষ্টির পর বিভেদের রাজনীতির ফলশ্রুতিতে আরও শক্তিশালী হয়ে জাতিসত্তা বিকাশে প্রবল ভূমিকা রাখে। বাংলায় ভাষা, সংস্কৃতি, সমাজ ব্যবস্থা, সামাজিক আচরণ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈশিষ্টগুলোর ওপর বিকশিত শক্তিশালী জাতিসত্তাকে কোনভাবেই কোন বিদেশী সংস্কৃতি দিয়ে বা কেবল ধর্মের গোঁড়ামি দিয়ে নির্মূল করা কোনভাবেই সম্ভব ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকসুলভ আচরণ ও কর্তৃত্ব প্রবণতা এই অমিলগুলোকে দৃঢ়তর করে পাকিস্তানকে আরও বেশি ভঙ্গুর করেছে। ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ববোধের বিষয়টি উদারমনা ও সভ্য বাঙালির কাছে তাই খুব আদিম ও স্থূল বিষয় হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। পাকিস্তানী শাসকেরা কখনও পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এই প্রদেশের জনগণের মতামত, আশা-আকাঙ্খা বা উপলব্ধি সম্পর্কে কোন আলাপ-আলোচনায় এ দেশের জনগণের নেতাদের আমলে নেয়নি। অর্থাৎ তাদের সব প্রকার সিদ্ধান্তগুলো ছিল একতরফা। এরা যেহেতু বাংলার মানুষের হৃদয়ের কথা বোঝার চেষ্টা করেনি সেহেতু প্রতি পদক্ষেপেই তারা ভুল করেছে এবং এ ধরনের প্রতিটি পদক্ষেপই পাকিস্তানকে ধীরে ধীরে ধ্বংসের দোরগোড়ায় নিয়ে গেছে ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে ত্বরান্বিত করেছে।

বাংলার মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের শুরু হয় ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে, যার সূচনা হয় বায়ান্নর অনেক আগে। কিন্তু বাঙালি জাতির প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ শুধু ভাষাভিত্তিক বৈষম্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি, প্রতিটি ক্ষেত্রেই পাকিস্তানের প্রদেশ হিসেবে ও নাগরিক হিসেবে এ দেশ ও এ দেশের মানুষ সমগ্র ২৩ বৎসরই অচিন্তনীয় বৈষম্যের শিকার হয়ে অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশায় নিমজ্জিত হতে থাকে। সব ধরনের বৈষম্যের মধ্যে সবচাইতে বিধ্বংসী রূপ পরিগ্রহ করে অর্থনৈতিক বিভেদের রাজনীতি, যা বহুলাংশে নির্ধারণ করে অন্য সব বৈষম্যের গতি-প্রকৃতি ও গভীরতা। বস্তুত:পক্ষে অর্থনীতি যেমন রাজনীতি ও সাংস্কৃতির বিকাশের ভিত্তিমূল হিসেবে কাজ করে, ঠিক সেভাবেই অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা একটি জাতিকে সব দিক থেকেই পিছিয়ে দেয়ার নিয়ামক হিসেবে আবির্ভূত হয়। বাঙালি জাতিকে শোষণের জাঁতাকলে পিষ্ট করার জন্য তাই পাকিস্তানিরা এ জাতিকে অর্থনৈতিকভাবে একটি পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত করার সব কৌশল ধারাবাহিকভাবে প্রয়োগ করে যেতে থাকে।

পূর্ববাংলায় সূচিত ও ক্রমবর্ধমান সামাজিক ও রাজনৈতিক অসন্তোষ ও বিক্ষোভের কারণ হিসেবে প্রকট অর্থনৈতিক বৈষম্যের রাজনীতি একটি প্রধান উপাদান হিসেবে কাজ করেছে। পাকিস্তানি শাসকেরা তথাকথিত ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের স্লোগান ও ভাবাবেগকে পুঁজি করে এ বৈষম্যের চর্চা করে গেছে বছরের পর বছর ধরে। এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল এ দেশকে ও দেশের মানুষকে পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ হিসেবে রেখে চিরকালের জন্য তাদের শোষণ ও শাসন চালিয়ে যাওয়া। পাকিস্তানের সৃষ্টিলগ্নে, অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে বাংলার মানুষের মাথাপিছু গড় আয় (Per capita income) ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোর গড় মাথাপিছু আয়ের সমান বা বেশি, যা ১৯৫৯-৬০ সালে কমে দাঁড়ায় ২৮৭ রুপিতে। এর বিপরীতে পশ্চিম পাকিস্তানে মাথাপিছু আয়ের ঊর্ধ্বমুখী ধারা এ সূচককে নিয়ে যায় ৩৩৮ রুপিতে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭০ সালে পূর্ববাংলার ৩৩১ রুপির বিপরীতে পশ্চিম পাকিস্তানে মাথাপিছু আয় দাঁড়ায় ৫৩৭ রুপিতে।

অনেক পাকিস্তানি ও এ দেশের পাকিস্তানপন্থিদের বিভিন্নভাবে বলতে শোনা যায় যে, ঐতিহাসিকভাবেই পাকিস্তানের পূর্ব অংশ অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান ছিল অনুন্নত, যা সত্যের অপলাপ। এ অঞ্চলের মানুষের গড় মাথাপিছু আয় এমন কি ব্রিটিশ শাসনের প্রাক্কালে অর্থাৎ ১৭৫৭ সালে ব্রিটেনের চেয়ে বেশি ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের আয়ের অন্যতম উৎস ছিল পূর্ব পাকিস্তান থেকে রফতানিকৃত পাট, পাটজাত দ্রব্য ও চা থেকে পাওয়া বৈদেশিক মুদ্রা, যা প্রথমে জমা হতো পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত রাষ্ট্রীয় কোষাগারে। পরে তা পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের মর্জিমাফিক বণ্টিত হতো দুই প্রদেশে। পাকিস্তানের জন্মের পর থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে পাকিস্তানের বৈদেশিক বাণিজ্য আয়ের শতকরা ৭০ ভাগ পাওয়া যেত পূর্ব পাকিস্তানের রফতানি দ্রব্য থেকে। এছাড়া পাকিস্তানের বৈষম্যের রাজনীতির অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করে এর বৈষম্যমূলক শুল্ক আহরণ পদ্ধতি, যা সাজানো হয়েছিল এমনভাবে, যাতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাপ্য শুল্ক পশ্চিম পাকিস্তানের কোষাগারে জমা হতো। ফলশ্রুতিতে পূর্ববাংলা অভ্যন্তরীণ শুল্কের ন্যায্য হিস্যা থেকে বছরের পর বছর বঞ্চিত হতে থাকে, যা এ অঞ্চলের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিশাল বাধা হিসেবে আবির্ভূত হয়।

বাজেট বণ্টনের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের নীতিও ছিল পুরোপুরি বৈষম্যমূলক। পূর্ব পাকিস্তান সব সময়ই পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে কম অর্থ বা সম্পদ বরাদ্দ পেত। বিশ্বব্যাংকের মতানুযায়ী পূর্ব পাকিস্তান থেকে স্থানান্তরিত অর্থ এবং এ অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রার উদ্‌বৃত্ত সবসময়ই পশ্চিম পাকিস্তানের আমদানি ও উন্নয়নে ব্যয় করা হতো। পশ্চিম পাকিস্তান সবসময়ই যৌথ ভান্ডার (Common fund) বা কেন্দ্রীয় বরাদ্দের বড় অংশটি পেত, যদিও পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু নাগরিক সে দেশের পূর্বাঞ্চলেই বসবাস করত। তাদের এ বৈষম্যমূলক আচরণের সঙ্গে পাকিস্তানিরা কিভাবে ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধকে সংযুক্ত করত, তা পূর্বাঞ্চলের মানুষের বোধগম্য ছিল না। ফলত বৈষম্যের শিকার পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের মধ্যে অসন্তোষ ও পশ্চিম পাকিস্তানিদের প্রতি অবিশ্বাস ও ঘৃণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগলো।

১৯৫০ থেকে ১৯৭০ সাল নাগাদ পাকিস্তানের পাঁচটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানে বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ সর্বদাই মোট বাজেটের এক তৃতীয়াংশের চেয়েও কম ছিল। ১৯৫৫-৬০ সালের বরাদ্দ ছিল এক-চতুর্থাংশের চেয়েও কম, শতকরা মাত্র ২৪ ভাগ। ১৯৫০ থেকে ১৯৭০, এই ২০ বছরে পাকিস্তানের মোট বাজেট ব্যয় ১৫৯,২৭০ মিলিয়ন রূপীর ১১৩,৩৪০ মিলিয়ন রূপী (৭১.১৬%) খরচ করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নে। পশ্চিম পাকিস্তানের মরুময় অঞ্চলগুলোতে বড় বড় সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন হতে থাকে পূর্বপাকিস্তানের কৃষক-শ্রমিকের টাকায়। অপরদিকে পূর্ব পাকিস্তানের উর্বর ভূমি রূপান্তরিত হতে থাকে মরুভূমিতে।

ক্ষুধা, দারিদ্র্য, শিশুমৃত্যু, রোগ-বালাই, দুর্ভিক্ষ, বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়ে দাঁড়ায় এ অঞ্চলের জনগণের নিত্যসঙ্গী। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী সুপরিকল্পিতভাবে এ দেশকে আরও বেশি দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দিতে থাকে যাতে করে একদিকে যেমন পাকিস্তানের এ অংশের নামে অধিক পরিমান বিদেশী সাহায্য নিয়ে আসা সম্ভব হয় ও তা নানা কৌশলে পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থে ব্যয় করা যায়, তেমনি অপরদিকে এদেশের মানুষ, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সর্বোপরি জীবন ব্যবস্থাকে প্রান্তিকতার শেষ সীমানায় ঠেলে দিয়ে এ দেশকে বহু যুগ, বহু শতাব্দী ঔপনিবেশিক শাসনের জাঁতাকলে পিষ্ট করে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করা যায়। প্রবল বৈষম্যের শিকার পূর্ব পাকিস্তানের মাথাপিছু গড় আয় বৃদ্ধির সূচক ১৯৬০-৬৫ সালে কমে দাঁড়ায় মাত্র ২.৬%। একই সূচক পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ছিল ৪.৪%। এই বৈষম্য ও নিম্ন প্রবৃদ্ধি ছিল সেনাশাসক আইয়ুব খানের তথাকথিত 'উন্নয়নের দশক' বা 'Decade of Progress' এর মধ্যলগ্নে। এ সময় আইয়ুব খানের এ দেশীয় মোসাহেব মোনায়েম খান, সবুর খান, ফজলুল কাদের গং এ দেশেই ঘটা করে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'উন্নয়নের দশক' পালন করছিল, আর বাংলার ছাত্র-জনতা সংগঠিত হচ্ছিল বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন জোরদার করার লক্ষ্যে। ১৯৬৬ সালেই বঙ্গবন্ধু তার ঐতিহাসিক 'ছয় দফা' আন্দোলন শুরু করেন, যা সারা বাংলায় অভুতপূর্ব সাড়া জাগায়। এর ওপর ভিত্তি করে দানা বাঁধতে থাকে ১১ দফার ছাত্র আন্দোলন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবর্তিত হয় সংগ্রামের অগ্নিভূমিতে। আইয়ুব খান আন্দোলন প্রশমিত করার লক্ষ্যে তথাকথিত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামি হিসেবে শেখ মুজিবকে ও আসামি হিসেবে এ দেশের সামরিক-বেসামরিক প্রশাসনের আরও অনেককে কারাগারে নিক্ষেপ করে।

সবচেয়ে উদ্বেগজনক ছিল রাজস্ব আয় পূর্ব পাকিস্তান থেকে সরিয়ে নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যবহার করার বিষয়টি। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৬ সালের একটি প্রবন্ধে দেখনো হয়েছে যে ১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৫৪ নাগাদ বছরগুলোর কোনটিতেই পূর্ব পাকিস্তান থেকে আহরিত রাজস্বের শতভাগ এখানে ব্যয় করা হয়নি। ১৯৫১-৫২ সালে পূর্ব পাকিস্তানে আহরিত রাজস্বের মাত্র ০.৪৩ ভাগ এদেশে ব্যয় করা হয়। পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তানে এ বছরগুলোতে সবসময়ই রাজস্ব আয়ের চেয়ে অনেক বেশি ব্যয় করা হতো। ১৯৪৯-৫০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানে এ ব্যয় সেখানকার রাজস্ব আয়ের ২২৩% বা দ্বিগুণেরও বেশি ছিল। সে বছরই পূর্বপাকিস্তানে তা ছিল এ প্রদেশের রাজস্ব আয়ের মাত্র ৭.৯৯%, আর ১৯৫৩-৫৪ সালে ২.৩৩%! ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৪ সাল নাগাদ পূর্ব পাকিস্তানের নিজস্ব রাজস্ব আয়ের মাত্র ২৬% খরচ করা হয় এ দেশের বিভিন্ন খাতে। বাকি ৭৪% আয় পাচার করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। এই সময়সীমায় পশ্চিম পাকিস্তানে সেখানে আহরিত রাজস্ব আয়ের দেড়গুণ বেশি খরচ করা হয় পূর্ব পাকিস্তান থেকে সম্পদ পাচার করে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে রাজস্ব আয়ের ক্ষেত্রে এমন কিছু পদ্ধতিগত বৈষম্য সৃষ্টি করা হয় যাতে করে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাপ্য বাণিজ্য ও বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কিত শুল্ক অবধারিতভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের কোষাগারে জমা হতো ও তা পশ্চিম পাকিস্তানের আয় হিসাবে দেখানো হতো। ফলত: একদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের রাজস্ব আয়ের বেশিরভাগ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের প্রাপ্য রাজস্ব, অপরদিকে সেই অন্যায্যভাবে বর্ধিত (Inflated) আয়ের দেড় থেকে দ্বিগুণ পশ্চিম পাকিস্তানে ধারাবাহিকভাবে ব্যবহৃত হতো পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাড়তি সম্পদ স্থানান্তরিত করে।

সম্পদ আহরণ ও ব্যবহারেরর এ বৈষম্য ও সম্পদ সরিয়ে নেওয়ার ধারা পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে নিঃস্বতা ও অসহায়ত্বের বেড়াজালে আবদ্ধ করতে থাকে। যথেচ্ছ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়ে এ দেশের মানুষের শিক্ষার হার যা পাকিস্তান সৃষ্টি লগ্নে ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে বেশি তা দ্রুত কমতে থাকে। ১৯৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষার হার ছিল মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৮.৮ ভাগ। বিপরীতে পশ্চিম পাকিস্তানে এই হার ছিল শতকরা ৭.৬ ভাগ। বৈষম্যের রাজনীতির ফলে শিক্ষার হারের বৃদ্ধিতে দুই প্রদেশে পরিলক্ষিত হয় সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী প্রবণতা। পূর্ব পাকিস্তানে পরবর্তী ১০ বৎসরে এ সূচক বৃদ্ধি পায় মাত্র ১০.৫৬ ভাগ, পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তানে তা বৃদ্ধি পায় প্রায় ৯০ শতাংশ। ব্যাপক ও নির্বিচার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য পূর্বপাকিস্তানের সামাজিক সূচকগুলোতে বিরূপ প্রভাব ফেলতে থাকে ও এই অঞ্চলের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেসন, ক্ষমতায়ন, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়নসহ সব খাত পিছিয়ে পড়তে থাকে। অন্যায্য সম্পদ আহরণ ও বণ্টন প্রক্রিয়া এ প্রদেশে সম্পদের অপ্রতুলতার সৃষ্টি করে। সেই সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কোন প্রকার দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা না থাকায় এ প্রদেশের বাসিন্দারা শিক্ষা, সমতা, ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবর্ণনীয় সমস্যার সম্মুখীন হতে থাকে। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীতে নিয়োগের বিষয়েও ছিলো বৈষম্য, যার ফলে অবাঙালিদের ছিলো সামরিক বাহিনীতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা, শতকরা ৯৫ ভাগ। যে ৫% বাঙালি সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলো তাঁদের মধ্যে দু'একজন ব্যাতীত কেউই উচ্চপদে আসীন ছিলো না। বেসামরিক প্রসাশন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণী পদগুলোও ছিল পশ্চিম পাকিস্তানীদের দখলে।

সামগ্রিকভাবে এ বিষয়টি এমনভাবে বিশ্লেষণ করা যায় যে পাকিস্তানের বৈষম্যের রাজনীতির ফলে বাংলার মানুষ অব্যাহত শোষণের শিকার হয়। এই শোষণ প্রক্রিয়া সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালিত হয় এ দেশের সম্পদ ধারাবাহিকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচারের উদ্দেশ্যে এবং এই বাংলাকে পশ্চিম পাকিস্তানের সদ্যজাত বুর্জোয়া শ্রেণীর উত্থানের একটি প্ল্যাটফর্ম হিসাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে। পাকিস্তানের শাসকবর্গের ও উঠতি বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্য পূর্ব বাংলা একটি উপ-উপনিবেশ ছাড়া আর কিছুই ছিল না, যেখান থেকে নির্বিঘ্নে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সেখানে নেওয়া যাবে ও যে অঞ্চল পশ্চিম পাকিস্তানের পণ্য বিক্রয়ের একটি বাজার হিসেবে বজায় থাকবে। এছাড়া এখানকার অন্যান্য সম্পদ প্রয়োজনানুযায়ী পাকিস্তানে নিরবচ্ছিন্নভাবে পাচার করা যাবে। পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের কল্পকাহিনী মূলত: ছিল সে দেশের শাসক ও এলিট শ্রেণীর ধোঁকাবাজির রাজনীতির হাতিয়ার।

পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাভাষার বিরুদ্ধে পাকিস্তানীদের যে ষড়যন্ত্রের শুরু তা পাকিস্তানের লজ্জাজনক আত্মসমর্পণের দিনের একদিন আগেও শেষ হয়নি। সকল সময়ই নতুন নতুন আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছে বাংলা ভাষা ও এ ভাষায় কথা বলা মানুষদের। ১৯৫২ সালে ভাষার জন্য আন্দোলনরত ছাত্র-জনতাকে নির্বিচারে হত্যার পরও এমন কি বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হওয়ার পরও পাকিস্তানীদের এ ষড়যন্ত্র থেমে থাকেনি, বরং নতুন নতুন রূপে আরও শক্তিশালী হয়ে বাংলার ওপর আঘাত হেনেছে। তাই বাঙালীকে এক পর্যায়ে অস্ত্র হাতে রুখে দাঁড়াতে হয়েছে বিদেশী শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে। পাকিস্তানী শাসনের অবসান হয় আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে, যার নেতৃত্বে ছিলেন বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, যিনি সারা জীবনের অক্লান্ত শ্রম, মেধা ও ত্যাগের বিনিময়ে বাঙালীর জাতীয়তাবোধকে জাগ্রত ও সুসংহত করে জনতাকে দীক্ষিত করেছেন স্বাধীনতার মন্ত্রে। নিজের জীবনের সকল কিছুর বিনিময়ে তিনি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন বাংলদেশকে।

১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখলের পর বাংলাবিদ্বেষী কর্মকাণ্ড তীব্রতর হলো। আইয়ুব-মোনায়েম চক্র এক পর্যায়ে ঢাকা বেতারে ও পরবর্তীতে টেলিভিশনে রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করলো। রাষ্ট্রীয় সকল প্রকার অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র সঙ্গীত বর্জন করা হয়। মানুষের মধ্যে বিকৃত ধর্মীয় বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে সংখ্যালঘু, বিশেষত হিন্দুবিদ্বেষী প্রচারণা চালানো হতে থাকলো অতি কৌশলে। এ সময়ই অনেক হিন্দু পূর্ব পাকিস্তানে তাদের ভিটামাটি ছেড়ে ভারতে চলে গেল। তৃণমূল পর্যায়ের মুসলিম লীগ নেতারা হিন্দুদের জমিজমা দখল করতে লাগল। অপরদিকে দেশছাড়া হিন্দুদের সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি হিসেবে পরিগনিত করার আইনী প্রক্রিয়া চলতে থাকল। বাংলার মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টানসহ অন্য সকলেই যে একই জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এই মূল্যবোধে মানুষকে উজ্জীবিত করার জন্য এ দেশের শিক্ষিত ও উদারপন্থী সমাজ তৃণমূল পর্যায় থেকে কেন্দ্রীয় পর্যায় পর্যন্ত তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তুলল। এই আন্দোলনের রাজনৈতিক নেতৃত্বে থাকে আওয়ামী লীগ এবং ছাত্র নেতৃত্বে থাকে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন। শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করে শ্রমিক লীগ, যেখানে ত্যাগী অনেক ছাত্র নেতা সর্বক্ষণিকভাবে শ্রমিকদের একতাবদ্ধ রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেত। পুরো ষাটের দশকে শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল আলম খান, অবদুল কুদ্দুস মাখন, তোফায়েল আহমেদ প্রমুখ ছাত্র নেতাদের সংগ্রামী ভূমিকা ও বঙ্গবন্ধুর প্রতি সীমাহীন আনুগত্য আমাদের জাতির স্বাধীনতার সকল সংগ্রামকে সফল করতে প্রধান ভূমিকা রেখেছে। এদের মধ্যে অনেকেরই পরবর্তী রাজনৈতিক ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ হলেও, স্বাধীনতার জন্য এঁদের অবদান চিরভাস্মর হয়ে থাকবে।

বাঙালির ওপর প্রথম আঘাতটি আসে তার মাতৃভাষার অধিকার হরণের ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে। এ ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে তরুণ শেখ মুজিবের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে ১৯৪৭ সালেই রচিত হয় 'রাষ্ট্রভাষা ইশতেহার' যা 'রাষ্ট্রভাষা-২১ দফা ইস্তেহার' নামে পরিচিতি পায়। এই দলিলটি প্রণয়ন করে এর সমর্থনে স্বাক্ষর গ্রহণ করা হতে থাকে। বাংলার মানুষের ভাষার অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ছাত্র সমাজকে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি তরুণ মুজিবের কাছে একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় হিসেবে প্রতীয়মান হয়। সেই উদ্দেশ্যেই ১৯৪৮ সালে শেখ মুজিবের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও ঐকান্তিক পরিশ্রমে গঠিত হয় ছাত্রলীগ। পরবর্তী সময়ে বাংলার মানুষের প্রতিটি অধিকার আদায়ে এই সংগঠনটির ধারাবাহিক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা এ দেশের ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে। ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা লগ্নেই মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে দশটি দাবি উত্থাপন করা হয় তার মধ্যে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিটি ছিল অন্যতম।

তাই বাংলার মানুষের নিজের মাতৃভাষার অধিকার আদায় ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামকে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম ধাপ হিসেবে অভিহিত করা হয়। এ যুদ্ধ ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু হয়ে পাকিস্তান আমলে আরও অনেক বেশি সুসংহত হয়। আপাতদৃষ্টে এটিকে একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন মনে করা হলেও এটি ছিল একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক আন্দোলন, যার পটভূমি রচিত হয়েছিল সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ও বাস্তবায়নের পথ ধরেই। ইতিহাসের বহু পথ পরিক্রম করে ভাষার অধিকার আদায়ের সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায় ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ২১ তারিখে, যেদিন ছাত্র-জনতার রক্তে রঞ্জিত হয় বাংলার রাজপথ। সেই সঙ্গে লিখিত হয় বাঙালী জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম অধ্যায়টি। ভাষা আন্দোলনের পথ ধরে আসে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের নিরঙ্কুশ বিজয়, ১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলন ও আইয়ুববিরোধী দুর্বার গন-আন্দোলন। ষাটের দশকে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলার মানুষের মুক্তির সংগ্রামের স্রোতধারা বেগবান হয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে থাকে শত্রুর সকল প্রতিরোধের দুর্গ। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুর ছয় দফার আন্দোলন অবির্ভূত হয় বাংলার মানুষের মুক্তির সনদ হিসেবে। ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ছিনিয়ে আনে বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের কারাগার থেকে। পাকিস্তানের লৌহমানব আইয়ুব খান পরাভূত হয়। ১৯৭০-এর নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুকে দেশের মানুষ দেশ শাসনের অধিকার দেয়।

অমর একুশের পথ ধরে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বাংলার জনতা তাদের সকল আশার প্রতিভূ যুক্তফ্রন্টকে প্রাদেশিক পরিষদে এনে দেয় নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা। পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২২৩টি আসন পায়, যা মোট আসনের শতকরা ৯৪ ভাগ ছিল। কিন্তু পাকিস্তানের প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের রাজনীতি বাংলার মানুষকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয় সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক পন্থায়। এই ষড়যন্ত্রের পথ ধরেই আসে আইয়ুব-মোনেম-ইয়াহিয়া-টিক্কা চক্র। সমান্তরালভাবে বেগবান হতে থাকে বাংলার মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। আর এই সংগ্রামের মাধ্যমেই শেখ মুজিব রূপান্তরিত হন বাংলার মানুষের প্রাণের নেতা বঙ্গবন্ধুতে। তাঁর নেতৃত্বে অনেক ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে, লাখো শহীদের প্রাণের বিনিময়ে, লাখো মা-বোনের অসীম ত্যাগের বিনিময়ে আমরা পাই স্বাধীন বাংলাদেশ।

বাঙালির সংগ্রাম ও বিজয়ের পথ ছিল কন্টকাকীর্ণ। এ সংগ্রামে বাংলার মানুষকে প্রতিহত করতে হয়েছে এমন এক হিংস্র রাষ্ট্রশক্তিকে যার রাজনৈতিক ইতিহাস ছিলো মানুষের অধিকার হরণ, শোষণ, বঞ্চনা, ষড়যন্ত্র ও অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের ইতিহাস। দেশটির আবির্ভাবের প্রথম দশকেই কমপক্ষে সাতজন প্রধানমন্ত্রী, চারজন গভর্নর জেনারেল এবং একজন প্রেসিডেন্টকে বলপূর্বক ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য করা হয়েছিল। পূর্ব বাংলার সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের ২৩ বছরের তথাকথিত ঐক্যের ১৩ বছর কেটেছে সরাসরি সামরিক শাসনের জাঁতাকলে। গণতন্ত্রহীনতা ও অধিকার হননের এই ২৩ বছরে সবচেয়ে বেশি নিগৃহীত হয়েছে বাংলার মানুষ। অথচ বাঙালীরাই ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের আলোকে দেশ গঠনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিল। পাকিস্তান আন্দোলনের ঘটনা পরম্পরা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে দেশ বিভাগপূর্ব গণভোটে (Plebiscite) বাংলা ও সিন্ধু ছাড়া আর সব প্রদেশই অবিভক্ত ভারতকে খন্ড-বিখন্ড করে পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধিতা করেছে। সিন্ধুতেও মুসলিম লীগ জিতেছিল মাত্র এক ভোটের ব্যবধানে। ইতিহাসের নির্মম পরিহাস হচ্ছে এই যে, পাকিস্তান গঠনে সবচেয়ে বেশি অগ্রণী ভূমিকা রাখা বাংলাই সবচেয়ে আগে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে সে রাষ্ট্র কাঠামো হতে।

প্রভুত্বব্যঞ্জক, আগ্রাসী ও উদ্ধতপথ ধরেই সর্বদা সকল পাকিস্তানী শাসকরা এদেশের জনগণের সকল প্রকার অধিকার আদায়ের অন্দোলনকে ভারতের ষড়যন্ত্র ও আগ্রাসনের প্রচেষ্টা বলে আখ্যায়িত করে দমন-পীড়ন চালিয়ে যেতে থাকে বছরের পর বছর ধরে। যখনই বাঙালিরা অধিকার, গণতন্ত্র, সমানাধিকারের দাবি সামনে নিয়ে আসতো তখনই পাকিস্তানের ধারক-বাহকের দল ধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যার মাধ্যমে বাংলার জনগণের দাবিগুলোকে পাকিস্তানের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আখ্যায়িত করে সেগুলোকে দাবিয়ে রাখত। একের পর এক ক্ষমতা দখলকারী পাকিস্তানের সামরিক শাসকের দল বাংলার জনগণের প্রাণের দাবিগুলোর সঙ্গে তথাকথিত ভারতের ষড়যন্ত্রের মন্ত্রকে একীভূত করে নিরীহ মানুষের ধর্মীয় সংবেদনশীলতাকে উস্কে দিয়ে তাদের কায়েমী স্বার্থকে রক্ষা করতে লাগলো। মানুষের জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ সামরিক ও আধাসামরিক শাসকের দল পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলো থেকে জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরানোর জন্য ধারাবাহিকভাবে জনগণের মাঝে ভারত বিরোধিতার বীজ বপন করে যেতে থাকলো। প্রয়োজনানুযায়ী ছোট বড় সীমান্ত সংঘাত বা যুদ্ধ বাঁধিয়ে শাসকরা নিজেদের ক্ষমতাকে সুসংহত করার প্রচেষ্টা ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের পর থেকেই চালিয়ে যেতে থাকলো। পাকিস্তানের অবৈধ ক্ষমতা দখলদারীদের জন্য এটা ছিল সবচেয়ে চতুর এবং ফলপ্রসূ কৌশল।

যখনই মানুষ গণতন্ত্র, সুশাসন বা মানবাধিকারের প্রশ্নে একতাবদ্ধ হওয়ার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হতো তখনই তারা তাদের আন্দোলনকে দমন করার জন্য ভারতীয় জুজুকে টেনে নিয়ে আসতো। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের অধিকার আদায়ের ধারাবাহিক আন্দোলন, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়, সর্বোপরি শত ষড়যন্ত্র ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের অভূতপূর্ব উন্নয়ন সারা বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের জন্য এই বার্তাই বহন করে যে- অত্যাচারী, অবৈধ ক্ষমতা দখলকারী শোষকের দল যত শক্তিশালীই হোক না কেন, শেষাবধি জনতার শক্তির কাছে তাদেরকে মাথা নত করতে হয়।

পাকিস্তানের সামরিক শাসকগণ এবং রাজনীতিবিদগণ কখনই বাংলাকে একটি উপনিবেশের চেয়ে বেশি মর্যাদা দেয়নি। দেয়ার কোন সদিচ্ছাও কোনকালে তাদের মধ্যে দেখা যায়নি। জিন্নাহর ১৯৪৮ সালের পূর্ব বাংলা সফরটি ছিলো একটি ব্যর্থ মিশন। মি: জিন্নাহ্'র রাষ্ট্রভাষা বিষয়ে অনড় অবস্থানই মূলত: এ সফরটিকে একটি প্রহসনে পরিণত করে। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা ঢাকায় ছাত্র-জনতার কাছে নিজেকে হাস্যাস্পদ প্রমানিত করে সফরের ইতি টানেন। কিন্তু প্রতিশোধ স্পৃহায় মত্ত পাকিস্তানীরা এরপর হতে যে কোন পন্থায় এ দেশের মানুষকে শিক্ষা দেয়ার মানসে তাদের অভিযাত্রা শুরু করে। অপরদিকে, পাকিস্তান সৃষ্টিতে অগ্রণী ভূমিকা রাখা বাঙালিদের মননে তখন থেকেই স্বাধিকারের বিষয়টি গেঁথে যায়। অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে সর্বস্তরে বিকশিত হতে থাকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনা। বাংলার মানুষের কাছে তখন থেকেই এটি পরিষ্কার হয়ে যেতে থাকে যে বাঙালিরা একটি আলাদা জাতি। একমাত্র ধর্ম ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানীদের সঙ্গে এদেশের মানুষের কৃষ্টি, সভ্যতা, ভাষা, কোনকিছুরই কোন মিল নেই।
বাঙালির সুদীর্ঘ সংগ্রামের সর্বোচ্চ পর্যায়ে ১৯৭১ সালে বাংলার মানুষ সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে ছিনিয়ে আনে কাঙ্খিত বিজয়। লাখো শহীদের রক্ত আর মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অভ্যুদয় হয় গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের। একাত্তরের অনলবর্ষী মার্চ থেকে বিজয়ের আলোয় আলোকিত ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত নয় মাসের দ্রুত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক, সামাজিক, বৈশ্বিক ও সামরিক আবহে বীর বাঙালি মিত্র শক্তির সহায়তায় পাকিস্তানী হানাদারদেরকে বাধ্য করে নতমস্তকে প্রকাশ্যে নি:শর্ত আত্মসমর্পনে। তিরানব্বই হাজার পাকিস্তানীকে বন্দী করা হয়, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রথমবারের মতো সারা বিশ্ব অবলোকন করে।

আমাদের বিজয়ের পথ ছিল ষড়যন্ত্রের বিষে পিচ্ছিল ও কন্টকময়। সেই ষড়যন্ত্র পরবর্তীতে হত্যা করেছে জাতির জনককে, মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী নেতাদের, অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধাকে। পাকিস্তানী সামরিক গোয়েন্দাদের চর-অনুচরের দল কৌশলে মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই আমাদের নেতৃত্বের ও নীতি নির্ধারকদের কাছাকাছি অবস্থান করে নেয় এবং সুযোগের অপেক্ষায় থাকে বাংলাদেশকে আবার পাকিস্তানের মতো আরেকটি ধর্মান্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করার। স্বাধীনতার সাড়ে তিন বছরের মধ্যেই হত্যা করা হয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবার ও তাঁর সবচেয়ে বিশ্বাসভাজন সহকর্মীদের, ঘটানো হয় পৃথিবীর ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকান্ডগুলোকে : জেলখানায়, জনসভায়, সেনানিবাসে, এমনকি প্রহসনের বিচারের মাধ্যমে। দীর্ঘ ২৬ বৎসর আমাদের জন্মভুমি পদদলিত হতে থাকে পাকিস্তানী অনুপ্রবেশকারী ক্ষমতা দখলকারী ও তাদের দোসরদের দ্বারা। হত্যাকারীদের বিচার বন্ধ করে তাদেরকে বাংলাদেশের রক্তস্নাত পতাকাকে পদদলিত করার সুযোগ করে দেয়া হয়। দীর্ঘকাল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার সুবাদে প্রশাসনে, সামরিক বাহিনীতে, ব্যবসা বাণিজ্যে, অর্থনীতির আনাচে-কানাচে সর্বত্র এখনও এদের অবাধ বিচরণ বিদ্যমান। সময়মতো এরা আবার আবির্ভূত হবে স্বমূর্তিতে। সে জন্যই জাতির সুসন্তানদেরকে সদা জাগ্রত থাকতে হবে যাতে করে কোন অপশক্তি আর জাতিকে বিভ্রান্ত করে স্বাধীনতা ও এর মূল্যবোধগুলোকে আর কখনো উৎপাটিত করার প্রয়াস না পায়।

তারিখ: ০৯.১২.২০২১

জহুরুল আলম। শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও লেখক।
প্রেসিডেন্ট, গভর্ন্যান্স এ্যান্ড রাইটস সেন্টার (জি.আর.সি.)।

শঙ্কর তালুকদার
সুবর্ণ জয়ন্তীর শ্রদ্ধায় বিজয় দিবসের শপথ

শোনো, একটি মুজিবরের থেকে
লক্ষ মুজিবরের কন্ঠস্বরের ধ্বনি, প্রতিধ্বনি
আকাশে বাতাসে ওঠে রণি।
বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ।

জনপদের থেকে জাতি, আর জাতির অস্তিত্ব অন্বেশনে ১৯৫২ সালে সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত বাংলা ভাষা থেকে "বাংলা", এরপর স্বাধীন দেশের জন্য আন্দোলন আর সংগ্রাম থেকে "দেশ"। এই দুটো ইতিহাস ও সংগ্রামকে এক করে "বাংলাদেশ" এক স্বার্থক দেশের নামকরণ, আর তা দারুণ ভাবে স্বার্থক যে, একথা আজ আর 'না' বলার উপায় নেই।

"সবুজ প্রাণের মনের খেয়ালে জলজংলায় ভরা সে দেশ,
জাতি ধর্মের ফারাক নেই যে, মানবতার তরে না বিদ্বেষ !
লোভী পিপাসু, ধর্মান্ধতায় জনমানসের রয় না অবশেষ-
তাই দাবী ওঠে অধিকার, স্বাধীনতা, জয় আর তার রেশ !
তেমন ভাবেই, সময়ের মধ্যে, জন্ম নিয়েছে বাংলাদেশ ;
আজকের কলমে সে বিজয় দিবসের উল্লেখ ও অবশেষ"

কঠিন ঊষর মৃত্তিকার দেশ পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বুনিয়াদি ছিল শোষণ, পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ তাই বিনিয়োগ হত পশ্চিম পাকিস্তানে ; তাই শাষনের নামে সেই শোষনের সাথে জুড়ে যেত অত্যাচার ! তাই, ক্রমপুঞ্জীতে ধারাবাহিক ভাবে ১৯৪৮ সালে শুরু হয় বাংলা ভাষার জন্য আন্দোলন, উর্দুকে সমগ্র পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা হিসেবে জোড় করে চাপিয়ে দিতে ও অধিক জনসংখ্যার বাংলা ভাষাকে বঞ্চিত করার প্রতিবাদে জেগে ওঠে জাতি ; স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির পথের দিশায় প্রথম মাইলফলক বলা যেতে পারে সেটিকে। যদিও ১৯৪০ সালে এই ভূখন্ডের আর এক মহান নেতা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাব পেশ করেছিলেন-এক অর্থে সেটিই ছিল স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মূল ভাবনার ভিত্তি প্রস্তর।

পরবর্তীতে, ১৯৪১ সালের ১৫ এপ্রিল মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে লাহোর প্রস্তাবকে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের গঠনতন্ত্রে একটি মৌল বিষয় হিসেবে গ্রহন করা হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের স্বাধীনতা পর্যন্ত এটি লীগের প্রধান বিষয় ছিল। অস্তিত্বের জানান দিতে বঙ্গবন্ধুও প্রায় সেই সময় থেকেই বাঙালির জন্য পৃথক রাষ্ট্র চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে এর উল্লেখও রয়েছে। অথচ ১৯৪৭ সালে ঐ সব ভাবনাতেই দেশ ভাগ হয়ে গেল। লক্ষ লক্ষ বাঙালী উদ্বাস্তু হয়ে মাতৃভূমি ও পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে সর্বহারা হলেন। উন্মাদ ধর্মীয় জিগিরে মানবতার কন্ঠ রোধ করে দেওয়া হল । তারও ২৪ বছর পরে মুক্তিযুদ্ধের লড়াই-যা বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ অর্জন। বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ আজ এক স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। এ স্বাধীনতা কুড়িয়ে পাওয়া একমুঠো মুক্তো বা বদান্যতার উপহার নয়, এর মধ্যে রয়েছে সুদীর্ঘ রক্তঝরা ইতিহাস।

সেদিনের আবেগ ছিল সীমাহীন সে ব্যক্তিত্বের! বাঙালি আবেগকে কেন্দ্র করে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল অসীম; মৃত্তিকাসংলগ্ন এবং সমুদ্র সমান ভালোবাসা দিয়ে এ জাতিকে গৌরবময় জীবনের সন্ধান দেওয়ার স্বপ্নে যা তৈরি করেছিলেন তিনি ! ভেবেছিলেন, একটি ভাষাগত ও জাতিগত রাষ্ট্রের উদ্ভব হলে তা সর্বকালের জন্য একটি দৃষ্টান্ত হবে। আগামীতে এ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিশ্বজুড়ে যদি অনেক রাষ্ট্রের জন্ম হয়, তাহলে আর কোনো বৃহৎ শক্তি থাকবে না সেদিন। কেউ কারও ওপর কর্তৃত্বও করতে পারবে না। মানবতা তখন ভাবনার স্তর থেকে বাস্তবের আঙিনায় লুটোপুটি খাবে সাড়া বিশ্বজুড়ে ! দু'দশক পেরিয়ে গেলেও কত গৃহহারা বাস্তুহারা বাঙালী তখনো ভারতের মাটিতে উদ্বাস্তু ক্যাম্পে সর্বহারার জীবন নিয়ে দিন গুজরাণ করছিলেন! স্বপ্নের ঢেউ মাটির টানে স্বাধীন দেশের ছবি দেখছিল তাঁরা, রাত জেগে বায়ুসেনাদের আর হানাদার খানসেনাদের আকাশ যুদ্ধ দেখে জয়বাংলা ধ্বনিতে মুখরিত করেছে "সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভাল বাসি" উচ্চারণে হৃদস্পন্দনে দোল এনেছিল সেদিন, মনে পড়লে এখনও চোখে জল আসে-আজ যদিও সে সবও ইতিহাস !

রাষ্ট্র ভাষা বাংলার দাবিতে প্রথম আন্দোলনে কারাবরণ করেছিলেন বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিব। এরপর বাংলার একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্তে ছুটে বেড়িয়েছেন তিনি। প্রতিটি বাঙালির কাছে পৌঁছে দিয়েছেন পরাধীনতার শিকল ভাঙার মহামন্ত্র। সাম্রাজ্যবাদের জঘন্ন চেহাড়া খুব তাড়াতাড়িই নখ, দাঁত বার ক'রে ফেলে শোষণের মানচিত্র রক্তাক্ত করতে থাকল ; পাকিস্তানের জন্মের শুরু থেকেই পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিকভাবে বশীভূত করা হয়। যদিও পূর্ব পাকিস্তান পাট রপ্তানির মাধ্যমে সমগ্র পাকিস্তানের সিংহভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করত, কিন্তু পূর্ববাংলাকে বঞ্চিত করে , তাঁদেরই রক্তের আয় দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হতে থাকল; অধিকাংশ বিনিয়োগই করা হতো পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নের কাজে। শৃঙ্খলিত হতে থাকল বাঙালীর রক্ত পাকিস্তানের শোষণের কাজে ; পাকিস্তানের পরিকল্পনা কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৯৫০-১৯৭০ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের জন্য সামগ্রিক বাজেটের মাত্র শতকরা ২৮.৭ ভাগ ব্যয় করা হতো। এর মধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ অনুভব করতে শুরু করছিল যে, তাদেরকে পাকিস্তানের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও জাতীয় অর্থনৈতিক সুবিধার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এই বৈষম্য দূর করার জন্য আওয়ামী লীগ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে স্বায়ত্তশাসনের জন্য ছয় দফার একটি পরিকল্পনা রচনা করেন। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪'র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৫৮'র সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, ১৯৬৬'র ৬ দফা ও পরে ১১ দফা আন্দোলন এবং ১৯৬৯ সালের গণ-অভুযত্থান প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার আন্দোলনে সফল নেতৃত্ব দেন বঙ্গবন্ধু।

১৯৬৯ সালের ২৪শে জানুয়ারি। সেদিন ছিল হরতাল। এই দিনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব খান সরকার বিরোধী আন্দোলন রূপ নেয় তীব্র এক গণঅভ্যুত্থানে। ১৯৬৬ সালে ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচির সাজুয্যে মুজিবের নেতৃত্বে স্বাধিকার আন্দোলনের গতি তীব্র হয়। পাকিস্তানি শাসকেরা তাকে নস্যাৎ করতে আগরতলা মামলা করে। মামলার প্রধান আসামি শেখ মুজিব সহ অন্যান্যদের মুক্তি ও পাকিস্তানি সামরিক শাসন উৎখাতের দাবিতে ১৯৬৯ সালের ২৪শে জানুয়ারি সান্ধ্যআইন ভঙ্গ করে সাধারণ মানুষ মিছিল বের করে। সেই মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণে প্রাণ হারান কিশোর মতিউর রহমান মল্লিকসহ চারজন। দেশভক্তি ও জাতীর প্রতি আন্তরিকতার মধ্য দিয়ে তিনি আবির্ভূত হন বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা তথা মহানায়ক হিসেবে । তুলে দেন সত্যিকারের প্রতিবাদের ঝড়। এই গণ-অভ্যুত্থান ছিল সরকারের বিরুদ্ধে সেই ঝড়ের দাপট ও উপযুক্ত জবাব।

মানবতার শত্রু সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণের লৌহকপাট ভেঙে উদ্ধার করতে হবে বঙ্গজননী মা'কে! রক্ত লোলুপ হানাদারদের বিরূদ্ধে এক হতে থাকে সমস্ত বাঙালীর আবেগ, দূর্যোগের ঘনঘটা ক্রমশঃই বিদ্রোহের আগুন জ্বালাতে সঙঘবদ্ধ হতে থাকে ! এর পর আসে, ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর। ঐ দিনটিতেই তৎকালীন অবিভক্ত পাকিস্তানের প্রথম এবং শেষ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আর সে নির্বাচনই স্বাধীন বাংলাদেশের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয়; নিঃশব্দে যেন আগাম বোধনের দামামা বেজে ওঠে বিজয় দিবসের।জাতীয় নির্বাচনে সাধারণ জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ এবং প্রায় ৬৫% ভোটারের ভোটদান সম্পন্ন হয়েছিল বলে পাকিস্তান সরকার নিজেই দাবী করেছিল। সেদিন সর্বমোট ৫৬,৯৪১,৫০০ রেজিস্টার্ড ভোটারের মধ্যে ছিল ৩১,২১১,২২০ জন পূর্ব পাকিস্তানের এবং ২৩,৭৩০,২৮০ জন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের ভোটার। নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গেল বিজয়ীর হাসি বাংলা মায়ের সন্তানদের পক্ষেই ! মোট ৩০০টি আসনের মধ্যে ১২,৯৩৭,১৬২টি ভোট, ১৬০ আসন ও ৩৯.২% ভোট পায় আওয়ামী লীগ যেখানে মাত্র ৬,১৪৮,৯২৩টি ভোট, ৮১টি আসন ও ১৮.৬% ভোট পায় জুলফিকার আলী ভুট্টোর দল; প্রাদেশিক নির্বাচনেও আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তান এ্যাসেম্বলীর নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় যদিও পশ্চিম পাকিস্তানের অপর চারটি এ্যাসেম্বলীতে তারা কোন আসন পায় না।

সমগ্র নির্বাচনের ফল পর্যালোচনা করলে দেখা যায়-
জাতীয় পরিষদে সংরক্ষিত মহিলা আসন সহ সমগ্র আসন সংখ্যার (৩১৩ টি) মধ্যে পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ছিল ১৬৯ টি। অন্যদিকে, পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ছিল ১৪৪ টি। নির্বাচনি ফলাফল অনুযায়ী আওয়ামী লীগ পূর্ব-পাকিস্তানের ১৬৯ টি আসনের মধ্যে ১৬৭ টি আসনেই জয়লাভ করে। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে পিপলস পার্টি ১৩৮ টি আসনের মধ্যে সর্বমোট ৮৮ টি আসন পায়। পাকিস্তান বুঝতে পারে বঙ্গবন্ধুর অমিত তেজ ও ক্ষমতার। এজন্য তাঁরা অবিভক্ত পাকিস্তানের পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হলেও বঙ্গবন্ধু ও তার দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে টালবাহানা করে কালক্ষেপণ করতে থাকে। এরপরেই ১৯৭১এর ৭ই মার্চের সেই ঐতিহাসিক ভাষন ! ঐ দিন দিপ্রহরে ২টা ৪৫ মিনিটে থেকে ৩টা ০৩ মিনিটে ঢাকার রমনায় অবস্থিত রেসকোর্স ময়দানে বা আজকের সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত জনসভায় বঙ্গবন্ধুর ১৮ মিনিটের সেই ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি বলেছিলেন-

"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

সত্যিই সে সংগ্রাম ছিল স্বাধীনতার জন্য, এনেও ছিল তা স্বাধীনতা, আর এই ১৬ ডিসেম্বরের বিজয় দিবস, যা এই আলেখ্যের প্রধান বিষয়- সেটিই ছিল সে লড়াইএর অন্তিম ফল। বঙ্গবন্ধুর ডাকে ৯ মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ শেষে ১৬ ডিসেম্বরর সেই চূড়ান্ত বিজয়, যা আজ সোনার বাংলাদেশের বিজয় দিবস! এক সাগর রক্ত ও ত্রিশ লক্ষ শহীদের প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে সে স্বাধীনতা আমাদের প্রাণের প্রিয় স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ। সেদিন বঙ্গবন্ধুর সে কন্ঠের কলমচিত্র ছিল অনেকটা এই রকম :-

"আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না। দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশের কোর্ট-কাচারী, আদালত-ফৌজদারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরীবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেজন্য যে সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলি আছে, সেগুলির হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিক্সা, গরুরগাড়ী, রেল চলবে— শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি গভর্নমেন্ট দপ্তর, ওয়াপদা কোন কিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেওয়া না হয়, এরপর যদি ১টি গুলি চলে, এরপর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়। তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবণের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। সৈন্যরা তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, তোমাদের কেউ কিছু কলবে না। কিন্তু আর তোমরা গুলি করবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবা না।"

প্রকৃতপক্ষে এর মাধ্যমেই মূলত বাংলার প্রাক স্বাধীনতা ঘোষণা করে দেন যেন বঙ্গবন্ধু। বাঙালির হৃদয়ে সে বার্তাও পৌঁছে যায়। আর একাত্তরের ২৬ মার্চ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে বন্দী হওয়ার আগে উন্মুক্ত কন্ঠে সরাসরি স্বাধীনতার ডাক দেন বঙ্গবন্ধু যা চট্টগ্রামে কালুরঘাট থেকে প্রচারিত হয় সে ঘোষণা । বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বের সেই পূর্ণ আবেগে সাড়া দিয়ে দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে জন্ম নেয় স্বাধীন বাংলাদেশ! এদেশের মানুষ বর্বর হানাদার পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর সেই বিজয় অর্জন করে। এই যুদ্ধে বিশ্বের দ্বিতীয় বাঙালী জনসংখ্যার দেশ ভারতের জনগন ও সরকারও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যে নৈতিক সাহস জুগিয়েছে তাও ছিল অফুরন্ত! স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে তাই এ দিনটি 'বিজয় দিবস' হিসেবে পালিত হয়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আমাদের বাংলাদেশের সাহসী ছেলেরা স্বাধীনতার জন্য সেদিন জীবন উৎসর্গ করেছেন-তাঁরা মুক্তিযুদ্ধের শহীদ। ঠিক সেরকমই সমাজ ও জীবনের একান্ত ভূমিকা পালনের মাধ্যমে তথা মুক্তি যুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাঙালী তথা পার্বত্য উপজাতীয় মহিলাদের ভূমিকাকেও কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না !

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকালের নারীসমাজকেও তাই অবলোকন করা দরকার আন্তরিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে। প্রথমত বুঝতে হবে যুদ্ধের সময় দেশের সর্বত্র যে বিপুল নারী নিগৃহীত হয়েছেন, তা কেবল তাঁরা নারী বলেই। নারীদের এও এক ধরনের যুদ্ধ, তাঁদের শরীরের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ; আর সেটা বুঝতে খানিকটা সময় লেগেছে রাষ্ট্র, সমাজ ও রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত সবারই। মুক্তিযুদ্ধে যোদ্ধাদের মতোই নারীরাও আত্মোৎসর্গ করেছেন, সেটা বুঝতে দেরী হলেও ক্রমে উঠে এসেছে বিপ্লবী নারীদের ইতিহাসও বিভিন্ন স্বীকৃতির মধ্যদিয়ে ! মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে বহুমাত্রিকভাবে নারীরা সেই যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। মুসলমান-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান সব ধর্মের নারীই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। কেবল বাঙালি নয়, সর্বাত্মকভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন আদিবাসী নারীরাও। এক কথায় সমগ্র জাতি একত্রে এই মহারণে জাতির স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়েছে পাকিস্তানী হানাদারদের কাছ থেকে ! তাই বাংলাদেশের সমগ্র জনজাতির সাহসী যুদ্ধ এবং সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের জন্য বাংলাদেশের গর্বিত বিজয় দিবস একটি জাতীয় দিবস এবং প্রতিবছর এদিনটি সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয় সমগ্র বাংলাদেশে।

বিগত বছরটি জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' হিসেবে পালিত হয়েছে। শপথের নূতন অধ্যায় শুরু হয়েছে দেশ জুড়ে এবং এই ২০২১ সাল মহান স্বাধীনতার 'সুবর্ণজয়ন্তী'। এ দুটো মাহেন্দ্রক্ষণকে সামনে রেখে এই বছরের বিজয় দিবস উদযাপন করছে জাতি। এবারের মহান বিজয় দিবস বাঙালির জাতীয় জীবনে তাই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্ববহ। বিজয় দিবসের ৫০তম পূর্তির সময় অঙ্গনে তাঁর সেই আকাঙ্খাগুলিই এখনো প্রাসঙ্গিক- বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন-

"আমি দেখায়া দিবার চাই দুনিয়ার কাছে যে, শান্তিপূর্ণ বাঙ্গালি রক্ত দিতে জানে, শান্তিপূর্ণ বাঙ্গালি শান্তি বজায় রাখতেও জানে। ...নতুন করে গড়ে উঠবে এই বাংলা। বাংলার মানুষ হাসবে, বাংলার মানুষ খেলবে, বাংলার মানুষ মুক্ত হাওয়ায় বাস করবে, বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত খাবে, এই আমার জীবনের সাধনা, এই আমার জীবনের কাম্য"!

তাই আসুন, আমরা তাঁর সেই ভাবনায় অনুরণিত হই, পালন করি আমাদের 'বিজয় দিবস' সেই শপথের মধ্যে দিয়ে, **'জয় বাংলা' !**

একাত্তরের ঘাতক ও দালাল

মানুষ হিসেবে এরাও এ বাংলার জল-হাওয়াতেই বেড়ে উঠেছে। কিন্তু ব্যক্তিস্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়েছে স্বাধীনতার চেতনাকে। মুক্তিযুদ্ধ ছিল তাদের চোখে ধর্মোদ্রোহিতা, এবং দেশদ্রোহিতাও। পাকিস্তানী প্রভুদের মনোরঞ্জনে এরা করেনি এহেন অপকর্ম নেই। নিজেরা হত্যা করেছে, মুক্তিকামীদের তুলে দিয়েছে হানাদারদের হাতে। ১০ লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমহানীতে এদের দায় প্রত্যক্ষই।

স্বাধীনতার জন্য জীবনদান যদি সর্বোচ্চ মূল্য হয় বাঙ্গালী জাতির মত এত বেশী মূল্য অন্য কোন জাতিকে দিতে হয় নি। অথচ স্বাধীনতার ষোল বছর অতিক্রান্ত না হতেই স্বাধীনতার ইতিহাস ও চেতনা নতুন প্রজন্মের নাগরিকরা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছে। এই বিস্মরণ অস্বাভাবিক নয় একারণে যে, স্বাধীনতার পর যে কয়টি সরকার আমরা পেয়েছি তারা কেউই মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে চায় নি। বরং চেয়েছে এই চেতনা গোটা জাতির স্মৃতি থেকে দ্রুত অবলুপ্ত হোক। যে কারণে গোলাম আজম, আব্বাস আলী খান বা মওলানা মান্নানের মতো একাত্তরের ঘাতকদের এদেশের রাজনীতিতে বা সরকারের মন্ত্রীসভায় স্থান করে নিতে দেখেও আমরা নিন্দা করি না, প্রতিরোধ গড়ে তুলি না।একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা যখন সরকার প্রশাসন, রাজনীতি কিম্বা শিল্প সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রে বসে ছুরি শানাচ্ছে আরেকটি গণহত্যার জন্য, সরকার তখন ব্যস্ত হয়ে পড়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রস্তুত করার জন্য। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে মুষ্টিমেয় লোক হানাদার বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তির উপর ইতিহাসের নৃশংতম গণহত্যা চালিয়েছিল। আমরা চিনি তারা কারা। একাত্তর বাহাত্তরের সংবাদপত্রে তাদের তৎপরতার খবর প্রকাশিত হয়েছে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে তাদের ধরিয়ে দেয়ার জন্য প্রতিদিন সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি ছাপা হয়েছে। অথচ আমাদের দুর্ভাগ্য সরকারী তত্বাবধানে রচিত মুক্তিযুদ্ধের ১৫ খন্ডের বিশাল ইতিহাসে তাদের নাম ছাপা হয় নি।

আরো বিস্মিত হই তখন—
যখন এইসব ঘাতকদের দেখি পত্রিকায় সদম্ভে ঘোষণা করে –
'একাত্তরে আমরা ভুল করি নি'।

কিম্বা যখন বলে
কিসের বিতর্কিত আমি ?

এবারে একাত্তরের ঘাতক ও দালালদের অবস্থান সম্পর্কে তুলে ধরা হলো :

কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি

১. খাজা খয়েরউদ্দিন	: মুসলিম লিগ নেতা, পাকিস্তান
২. একিউএম শফিকুল ইসলাম	: অ্যাডভোকেট, লাহোর হাইকোর্ট
৩. গোলাম আজম	: আমির, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৪. মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ মাসুম	: কেন্দ্রীয় মজলিশে সাদারাত সদস্য, বাংলাদেশ ইত্তেহাদুল উম্মাহ
৫. আব্দুল জব্বার খদ্দর	: স্বাধীনতার পর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়
৬. মাহমুদ আলী	: সমাজকল্যাণ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী, পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার
৭. এমএকে রফিকুল ইসলাম	: তথ্য পাওয়া যায়নি
৮. ইউসুফ আলী চৌধুরি (মোহন মিয়া)	: স্বাধীনতা যুদ্ধকালে স্বাভাবিক মৃত্যু হয়
৯. আবুল কাশেম	: স্বাধীনতার পর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়।
১০.গোলাম সারওয়ার	: নেতা, লন্ডনে জামাতিদের সংগঠন দাওয়াতুল ইসলাম পরিচালক, লন্ডন ভিত্তিক ইসলামিক ইনস্টিটিউট
১১. সৈয়দ আজিজুল হক (নান্না মিয়া)	: কেন্দ্রীয় নেতা এবং জাতীয় সংসদ সদস্য, জাতীয় পার্টি
১২. এ এসএম সোলায়মান	: সভাপতি, বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক পার্টি
১৩. পীর মোহসেনউদ্দিন (দুদু মিয়া)	: সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ ডেমোক্রেটিক লীগ
১৪.শফিকুর রহমান	: চেয়ারম্যান, ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ
১৫. মেজর (অবঃ) আফসারউদ্দিন	: আহবায়ক, বাংলাদেশ গণতন্ত্র বাস্তবায়ন পরিষদ সভাপতি, ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি
১৬. সৈয়দ মোহসেন আলী	: প্রাক্তন সভাপতি, শিল্প ও বণিক সংস্থা এবং ঢাকা স্টক এঙ্চেঞ্জ, প্রাক্তন পরিচালক, আইএফআইসি ব্যাঙ্ক
১৭. ফজলুল হক চৌধুরী	: স্বাধীনতার পর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়
১৮. মোঃ সিরাজুদ্দিন	: সভাপতি (ঢাকা শহর), বাংলাদেশ মুসলিম লীগ
১৯.এডভোকেট এ টি সাদি	: অবসরপ্রাপ্ত, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
২০. এডভোকেট আতাউল হক খান	: সহসভাপতি, বাংলাদেশ মুসলিম লিগ
২১.মকবুলুর রহমান	: শিল্পপতি
২২. আলহাজ্ব মোঃ আকিল	: ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, বাংলাদেশ নেজামি ইসলামী দল
২৩.প্রিন্সিপাল রুহুল কুদ্দুস	: কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদ সদস্য, বাংলাদেশ জামাতে ইসলামী
২৪.নুরুজ্জামান	: পরিচালক, ইসলামী উন্নয়ন ব্যাঙ্ক
২৫. মওলানা মিয়া মফিজুল হক	: কেন্দ্রীয় মজলিশে সাদারাত সদস্য, বাংলাদেশ ইত্তেহাদুল উম্মাহ
২৬. এডভোকেট আবু সালেক	: সিনিয়র এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
২৭. এডভোকেট আবদুন নাঈম	: স্বাধীনতার পর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়
২৮. মওলানা সিদ্দিক আহমেদ	: কেন্দ্রীয় মজলিশে সাদারাত সদস্য, বাংলাদেশ ইত্তেহাদুল উম্মাহ
২৯. আবদুল মতিন	: মহাসচিব, বাংলাদেশ মুসলিম লীগ
৩০. ব্যারিস্টার আখতার উদ্দিন	: আইন উপদেষ্টা, সৌদিয়া ইন্টারন্যাশনাল, সৌদি আরব
৩১.তোয়াহা বিন হাবিব	: সদস্য, কেন্দ্রীয় মজলিশে সুরা বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন
৩২. হাকিম ইরতিজায়ুর রহমান	: স্বাধীনতার পর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়
৩৩. রাজা ত্রিদিব রায়	: করাচিতে ব্যবসা করছেন
৩৪. ফয়েজ বক্স	: সভাপতি, নিখিল বাংলাদেশ মুসলিম লিগ।

মালেক মন্ত্রীসভা

১.আবুল কাশেম	: আগে বলা হয়েছে
২.নওয়াজেশ আহমেদ	: সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ মুসলিম লিগ
৩.এ এস এম সোলায়মান	: আগে বলা হয়েছে
৪.ওবায়দুল্লাহ মজুমদার	: কেন্দ্রীয় মজলিশে সুরা সদস্য, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন
৫. আব্বাস আলী খান	: ভারপ্রাপ্ত আমির, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৬.মওলানা একেএম ইউসুফ	: মহাসচিব, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৭.মওলানা ইসহাক	: মজলিশে সুরা সদস্য, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন
৮.শামসুল হক	: তথ্য পাওয়া যায়নি
৯.জসিমুদ্দিন আহমেদ	: স্বাধীনতার পর স্বাভাবিক মৃত্যু
১০.আখতারুদ্দিন আহমেদ	: আগে বলা হয়েছে
১১. অংশু প্রু চৌধুরী	: প্রাক্তন মন্ত্রী (বিএনপি)
১২. এএম মোশাররফ হোসেন	: মহাসচিব, ইসলামি ডেমোক্রেটিক লিগ

<u>আল-বদর হাইকমান্ড</u>

১. মতিউর রহমান নিজামী	: প্রধান, আল-বদর হাইকমান্ড, সারা পাকিস্তান
২. আলী আহসান মুহম্মদ মুজাহিদ	: প্রধান, আল-বদর হাইকমান্ড, পূর্ব পাকিস্তান
৩. মীর কাসেম আলী	: প্রধান, আল-বদর হাইকমান্ড, চট্টগ্রাম
৪. মোহাম্মদ ইউনুস	:
৫. মোহাম্মদ কামারুজ্জামান	: প্রধান, বদর বাহিনী
৬. আশরাফ হোসাইন	: প্রতিষ্ঠাতা, বদর বাহিনী
৭. মোহাম্মদ শামসুল হক	: প্রধান, আল-বদর হাইকমান্ড, ঢাকা
৮. মোস্তফা শওকত ইমরান	: নেতা, বদর বাহিনী, ঢাকা
৯. আশরাফুজ্জামান খান	: প্রধান জল্লাদ, বুদ্ধিজীবি হত্যাকান্ড, ঢাকা
১০.আ.শ.ম রুহুল কুদ্দুস	: নেতা, বদর বাহিনী, ঢাকা
১১.সরদার আবদুস সালাম	: প্রধান, বদর বাহিনী,ঢাকা
১২. চৌধুরী মঈনুদ্দিন	: অপারেশন ইনচার্জ, বুদ্ধিজীবি হত্যাকাণ্ড সম্পাদক, সাপ্তাহিক দাওয়াত

<u>ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়</u>

১. বেগম আখতার ইমাম	: প্রভোস্ট, রোকেয়া হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২.ডঃ কাজি দীন মোহাম্মদ	: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৩. ডঃ মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান	: অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৪. ডঃ ফাতিমা সাদিক	: অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৫. ডঃ গোলাম ওয়াহেদ চৌধুরী	: অধ্যাপক, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৬.ডঃ রশিদুজ্জামান	: অধ্যাপক, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৭. ডঃ একেএম শহীদুল্লাহ	: অধ্যাপক, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৮.একেএম জামালউদ্দিন মোস্তফা	: অধ্যাপক, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৯. মোঃ আফসারউদ্দিন	: অধ্যাপক, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১০. ডঃ মীর ফখরুজ্জামান	: অধ্যাপক, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১১. ডঃ মোঃ শামসুল ইসলাম	: অধ্যাপক, পদার্থ বিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১২. ডঃ আব্দুল জব্বার	: অধ্যাপক, ফার্মেসি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১৩. ডঃ মাহবুবউদ্দিন আহমেদ	: অধ্যাপক, পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তথ্যসূত্র :

১। একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়, প্রকাশনা মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮।

ফটোগ্রাফি

শাহরিনা চৌধুরী

ছাতা'য় বিজয়ের লাল সবুজ

কাজী মিরা

বাগানে বিজয়ের লাল সবুজ

ফটো গ্যালারী

তথ্যসূত্র :

১। মুক্তিযুদ্ধ আর্কাইভ